ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র

ষষ্ঠ শ্রেণী

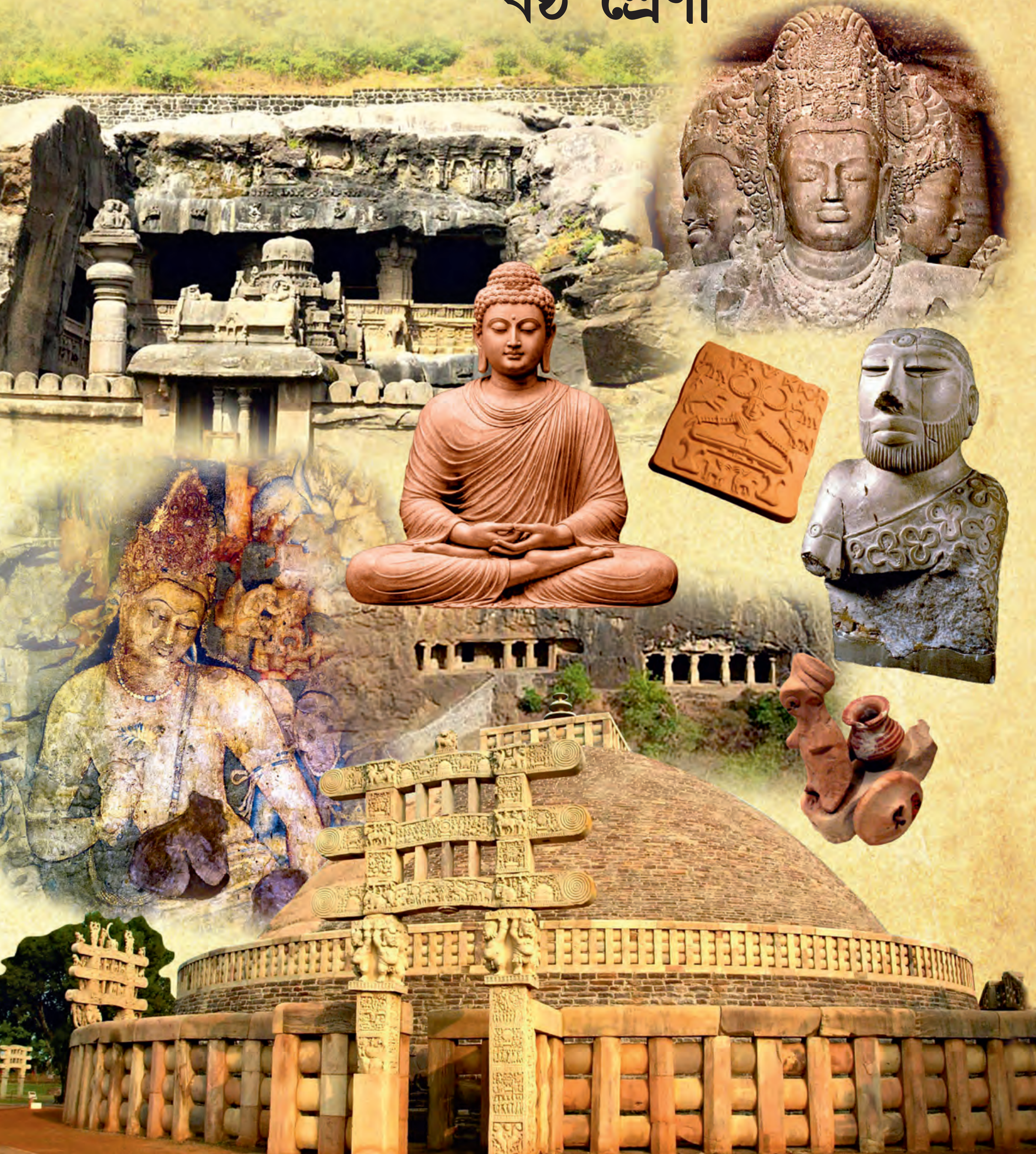

Tele MANAS
National Tele Mental Health Programme
14416

টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪×৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস - 2116/(প্র.ক্র.43/16) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ-19.05.2026-এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাগত বর্ষ 2026–27 থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

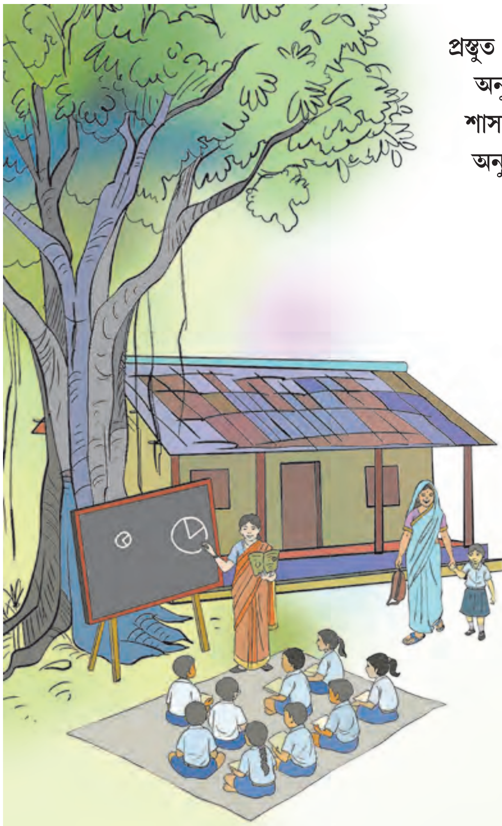

ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র

ষষ্ঠ শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

ছকের মধ্যে দেওয়া Q.R. Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকের উপাদানগুলি সম্পর্কিত দৃশ্য, শ্রাব্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য অধ্যয়ন-অধ্যাপন সামগ্রীও উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004
এই পুস্তকের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধীনে সুরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

ইতিহাস সমিতি

ড. শুভাঙ্গনা আত্রে, সভাপতি
শ্রী কিশোর পাটিল, সদস্য
শ্রীমতী মুগ্ধা লেলে, সদস্য
ড. শিবানী লিময়ে, সদস্য
শ্রী পঙ্কজ শিন্দে, সদস্য
ড. অনুজা শিন্দে, সদস্য
শ্রী অরুণ ইঙ্গলে, সদস্য
শ্রীমতী সুমন গায়কোয়াড, সদস্য
শ্রী তারাচন্দ্র আওয়ালে, সদস্য
শ্রী কুশলকুমার সমরিত, সদস্য
শ্রী বিক্রম আডসুল, সদস্য
শ্রী প্রশান্ত শেওয়তকর, সদস্য
শ্রী সুহাস ঘস, সদস্য
ড. সচিন ডেঙ্গলে, সদস্য
শ্রী নীলেশ বনকর, সদস্য
শ্রী শ্রীকান্ত বাপট, সদস্য
শ্রী সোমেশ শর্মা, সদস্য
শ্রী নিনাদ তেন্ডুলকর, সদস্য
ড. সিদ্ধার্থ জাধব, সদস্য
ড. বিজয় মানে, সদস্য
শ্রী শঙ্কর খরাত, সদস্য
ড. প্রশম কোলহে, সদস্য
ড. রাজানন্দ পট্টেবাহাদুর, সদস্য
ড. নলিনী বাঘমারে, সদস্য
শ্রী রামেশ্বর লোটকে
(পাঠ্যক্রম সমন্বয়ক)
শ্রী অরুণ জাধব
(পাঠ্যক্রম সমন্বয়ক)
শ্রীমতী বর্ষা সরোদে, সদস্য-সচিব

নাগরিকশাস্ত্র সমিতি

ড. হর্ষদ ভোসলে, সভাপতি
ড. প্রিয়া ইঞ্জলকর, সদস্য
শ্রী অবিনাশ বাগাডে, সদস্য
শ্রী চন্দ্রহাস হিপ্পারকর, সদস্য
শ্রী প্রশান্ত জোশী, সদস্য
অধ্যাপিকা সুনিতা দলবী, সদস্য
শ্রী শ্যাম রাউত, সদস্য
ড. শিবাজী রেণাপুরে, সদস্য
শ্রী কৃষ্ণা রোকাডে, সদস্য
শ্রীমতী অঞ্জলি ঢমাল, সদস্য
শ্রী শিবাজী করালে, সদস্য
ড. রাজেশ পাওয়ডে, সদস্য
শ্রী বালু ভোসলে, সদস্য
ড. সুচিত্রা ঘোগরে-কাটকর, সদস্য
ড. ব্যঙ্কটেশ খরাত, সদস্য
ড. জ্যোতি বুওয়া, সদস্য
ড. প্রভাকর লোন্ডে, সদস্য
ড. নন্দকিশোর বোকাডে, সদস্য
শ্রী নারায়ণ মুদগলওয়াড, সদস্য
শ্রী দত্তাত্রয় রাঠোড, সদস্য
ড. বালাসাহেব কিলচে, সদস্য
শ্রী রবীন্দ্র জিন্দে, সদস্য
ড. সেন্দ্রিত জোশী, সদস্য
ড. নেহা আগাশে, সদস্য
শ্রীমতী বর্ষারানী ভোপলে
(পাঠ্যক্রম সমন্বয়ক)
শ্রীমতী বর্ষা সরোদে, সদস্য-সচিব

কেন্দ্রীয় সমিতি

ড. মহেশ্বর কললাবে
শ্রী মোহন শেটে
শ্রী প্রশান্ত দিবেকর
শ্রীমতী প্রতিমা গুপ্তে

গুণমান সমীক্ষক

ড. মঞ্জিরী ভালেরাও
(গুণমান পরীক্ষক)
ড. সঞ্জ্যোত আপটে
(গুণমান পরীক্ষক)
এড. জয়শ্রী আওহাড
(বিধি-বিশেষজ্ঞ)
ড. শর্মিষ্ঠা ওক
(CWSN বিশেষজ্ঞ)

লেখক : ড. প্রিয়া গোহাড
ড. পরিমল সুধাকর
প্রো. শিবাজী মোটেগাওকর

সংযোজক

শ্রীমতী বর্ষা সরোদে
(ভারপ্রাপ্ত বিশেষাধিকারী)
ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র, পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে।

প্রকাশক

শ্রী হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বাই-25

বাংলা ভাষান্তর সংযোজক

ড. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী, হিন্দী ভাষা (বি.কা.)
শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস
সহায়ক বিশেষাধিকারী, বাংলা ভাষা (বি.কা.)

বাংলা ভাষান্তর বিষয়তজ্ঞ

প্রা. শ্রী অপূর্ব অরবিন্দু শীল (ভাষান্তর)
অধ্যাপক শ্রী সনত সন্ন্যাসী দেবনাথ (সমীক্ষক)
শ্রী মহাদেব দে (বিষয় তজ্ঞ)
শ্রী অনিমেশ বিশ্বাস (বিষয় তজ্ঞ)

মুখপৃষ্ঠ ও চিত্রাঙ্কন : শ্রী দেবদত্ত বলকওয়াডে
অক্ষরাঙ্কন-ডিজাইনিঙ্গ : সমর্থ গ্রাফিক্স্, 522, নারায়ণ পেঠ, পুণে-30
কাগজ : 70 জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ :
মুদ্রক :

নির্মিতি

শ্রীমতী মিতালী শিতপ
প্র. মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী শশাঙ্ক কানিকডলে
নির্মিতি অধিকারী

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে।

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ। সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ।।

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।१।।

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ।।२।।

প্রস্তাবনা

'জাতীয় পাঠ্যক্রম ২০২০' অনুসারে 'মহারাষ্ট্র রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম ২০২৬' তৈরি করা হয়েছে। এই সরকার অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র বিষয়টি 'আমাদের চারপাশের জগৎ ভাগ-২'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে পরবর্তী পাঠ্যক্রমে ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্রের আলাদা পাঠ্যপুস্তক থাকবে। এই পাঠ্যপুস্তকটি তোমাদের হাতে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা, পঞ্চকোশ, একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতা, বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যভিত্তিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিক্ষার্থী প্রক্রিয়া এই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে এই পাঠ্যপুস্তকটি তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কোন শিক্ষণ-নিষ্পত্তি গড়ে উঠবে, সেই অনুযায়ী পাঠের বিভিন্ন কার্যক্রম, শিক্ষণ-অভিজ্ঞতা ও উপক্রমসহ বিষয়বস্তুর নতুনত্বপূর্ণ বিন্যাস করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠা করা। তাই এই পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাসের অংশে 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পায়, এবং এর দ্বারা তাদের সামাজিক একাত্মতাবোধ বৃদ্ধি পায়, এটাই উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মানবজাতির বিবর্তন, সংস্কৃতির বিকাশ এবং সভ্যতার সমৃদ্ধ পরম্পরার সাক্ষী। এই পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাসের অংশে বস্তুগত উপকরণ, শিলালিপি, মুদ্রা, সাহিত্যিক গ্রন্থ, বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তের মতো ঐতিহাসিক উৎসের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস কীভাবে উদ্ঘাটিত হয়, তার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রস্তরযুগের যাযাবর অবস্থা থেকে স্থায়ী কৃষি, বসতি এবং নগর সভ্যতা পর্যন্ত যাত্রাপথ এই পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতি, বৈদিক কাল, মহাজনপদের উদ্ভব, মৌর্য, শুঙ্গ, সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সহজ ও অধ্যয়নযোগ্য পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কালপর্বের শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সমাজকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, আয়ুর্বেদ, দর্শন ও ধর্মের মতো সাংস্কৃতিক দিকগুলির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের প্রভাব শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এশিয়া ও অন্যান্য প্রাচীন বিশ্বেও কীভাবে পড়েছিল, তাও বিবেচনা করা হয়েছে। বাণিজ্য, ধর্ম, শিল্প প্রভৃতি মাধ্যমে ভারতের সাথে চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সম্পর্ক স্পষ্ট করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিকে সংলাপধর্মী করার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে বিভিন্ন ছকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আরও কার্যমুখী করার চেষ্টাও করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল জাগানো, অতীতকালের উপলব্ধি বাড়ানো এবং ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি সচেতনতা তৈরি করা এটাই এই পাঠ্যপুস্তকের মূল লক্ষ্য।

নাগরিকশাস্ত্রের অংশে 'স্থানীয় শাসন সংস্থা' বিষয়ে তথ্য নেওয়ার সময়ে উন্নয়নের পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের অংশগ্রহণের ফলে ঘটা পরিবর্তনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শাসন সংবিধান, আইন ও বিধি অনুযায়ী চলে, এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সহজ ভাষায় বলা হয়েছে। পাঠে ছকের মধ্যে দেওয়া তথ্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষণকে আরও কার্যকর করতে পারবে। শিক্ষকদের জন্য আলাদা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষণ যতটা সম্ভব কার্যভিত্তিক হওয়া উচিত, তার জন্য উপক্রম দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী সচেতন নাগরিক গড়ে তোলার জন্য এই পাঠের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পাঠ্যপুস্তকটি যতটা সম্ভব নির্ভুল ও মানসম্পন্ন হওয়া উচিত, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র থেকে বাছাই করা শিক্ষক, পাশাপাশি কিছু শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও বিষয়বিশেষজ্ঞের দ্বারা এই পাঠ্যপুস্তকের সমালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত পরামর্শ ও মতামত সযত্নে বিবেচনা করে এই পাঠ্যপুস্তককে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। মণ্ডলের ইতিহাস বিষয় সমিতি ও নাগরিকশাস্ত্র বিষয় সমিতির সদস্য, লেখক এবং চিত্রশিল্পীরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই পাঠ্যপুস্তকটি তৈরি করেছেন। মণ্ডল তাদের সকলের কাছে মনঃপূর্বক কৃতজ্ঞ।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা এই পাঠ্যপুস্তকটিকে স্বাগত জানাবেন বলে আশা রইল।

ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্রের আনন্দদায়ক শিক্ষণের জন্য শুভেচ্ছা !

(অনুরাধা ওক)
সঞ্চালক,
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

পুণে
তারিখ : 01-05-2026
ভারতীয় সৌর : বৈশাখ 11,
শকে 1948, মহারাষ্ট্র দিন

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য, অধ্যয়ন দক্ষতা এবং শিখন ফলাফল

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG – ১. মানবজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত উৎসসমূহ (Sources) অনুধাবনউপলব্ধি করা এবং সেগুলোর অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা।

ক্র.	অধ্যয়ন দক্ষতা	শিখন ফলাফল	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	**ইতিহাসের উৎস (উপকরণ)**		
	C – ১.১ মানবজীবনের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক দিকগুলি বোঝার জন্য তথ্যের একাধিক উৎস (প্রাথমিক ও গৌণ) সংগ্রহ করে এবং তার অর্থ নির্ণয় করে।	• প্রাচীনকালের মানবজীবনের বিভিন্ন দিক বোঝার জন্য ইতিহাসের উৎস ব্যাখ্যা করে, তার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ও তার অর্থ নির্ণয় করে।	১,২,৩,৪,৫,৬,৭
		ক) প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান উৎসগুলি বর্ণন করে।	২,৩,৪,৫,৬,৭
		খ) ইতিহাসের গৌণ উৎস সম্পর্কে আলোচনা করে।	২,৩,৪,৫,৬,৭
		গ) ইতিহাসের ভৌতিক উৎসগুলির নাম উল্লেখ করে তথ্য অনুধাবন করে।	২,৩,৪,৫,৬,৭
		ঘ) ইতিহাসের লিখিত উৎস সমূহ সনাক্ত করার মাধ্যমে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক অনুধাবণ করে।	২,৩,৪,৫,৬,৭
		ঙ) ইতিহাসের মৌখিক উৎস সনাক্ত করার মাধ্যমে তথ্য অনুধাবন করে।	২,৪,৫,৬,৭
		চ) ঐতিহাসিক গবেষণার বিভিন্ন (ভৌতিক/লিখিত/মৌখিক) শ্রেণীকরণ করে।	২,৩,৪,৫,৬,৭
		• মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন খনন-স্থান, ঐতিহ্যস্থান, বস্তু-সংগ্রহালয়ের নাম বলে মহারাষ্ট্রের মানচিত্রে দেখিয়ে তাদের তথ্য জানায়, তাদের সংরক্ষণ ও সম্পর্ধনের গুরুত্ব বুঝে নেয় এবং মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করে।	৫,৬,৭,১৩,১৪,১৫
		ক) মহারাষ্ট্রের মানচিত্রে সংখানকার বিভিন্ন খনন স্থল এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান সমূহ দেখায়।	১৩,১৪,১৫
	C – ১.২ বিষয়বস্তু, তালিকা, রেখাচিত্র, মানচিত্র আকারে দেওয়া মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করে।	খ) মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জাদুঘর পরিদর্শন করে এবং তথ্য লেখে।	১৩,১৪
		• বিষয়বস্তু, তালিকা, রেখাচিত্র, মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে প্রাচীনকালের মানবজীবনের দিকগুলির সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও শ্রেণীবিভাগ করে।	৮,৯,১০,১১,১২, ১৩,১৪,১৫
		ক) শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগত তথ্য সংকলন ও অনুধারণ করে।	৮,৯,১০, ১২, ১৩,১৪,১৫
		খ) চিত্রের সাহায্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে এবং শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে তা অনুধারণ করে।	৮,১০,১৪
		গ) প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক মানচিত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানচিত্র মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থলগুলি চিহ্নিক করে এবং তার ভিত্তি তত্ব সংগ্রহ করে শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে বুঝে নেয়।	৯,১৪,১৫
		ঘ) সারিণীর সাহায্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তত্ব সংগ্রহ করে এবং শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে বুঝে নেয়।	৮,১০,১৩,১৪,১৫

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG – ১. মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের সংশ্লিষ্ট উৎস আয়ত্ত করা এবং অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করা।
CG – ২. মানব সংস্কৃতিতে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার হদিস কিছু নির্দিষ্ট উদাহরণ ও তাদের প্রসঙ্গ এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সাহায্যে খোঁজা।

ক্র.	অধ্যয়ন দক্ষতা	শিখন ফলাফল	পৃষ্ঠা সংখ্যা
২	**মানব বিকাশের স্তরগুলি**		
	C– ১.১ মানবজীবনের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক দিকগুলি বোঝার জন্য তথ্যের একাধিক উৎস (প্রাথমিক ও গৌণ) সংগ্রহ করে এবং তার অর্থ নির্ণয় করে।	• মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন খনন-স্থান, ঐতিহ্যস্থান, বস্তু-সংগ্রহালয়ের নাম বলে মহারাষ্ট্রের মানচিত্রে দেখিয়ে তাদের তথ্য জানায়, তাদের সংরক্ষণ ও সম্পর্ধনের গুরুত্ব বুঝে নেয় এবং মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করে।	১৩,১৪,১৫
		ক) মানচিত্রে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান দেখায় এবং সেগুলির সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুত্ব ব্যাখা করে।	৬,১৫
	C– ২.১-অতীতের প্রধান পরিবর্তনগুলি এবং সমাজে তাদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিশ্লেষণ করে।	• প্রাচীন কালপর্বের মানব সংস্কৃতির তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিবর্তনের হদিস নিয়ে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক যাত্রাপথে ঘটা প্রভাব ব্যাখ্যা করে এবং মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বুঝে নেয়।	১০,১১,১২,১৩, ১৪,১৫
		ক) প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশে বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্টের প্রভাব ব্যাখ্যা করে।	৯,১০,১৬,১৭,১৮
		খ) প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারণা বুঝে নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে মানব সংস্কৃতির অগ্রগতি ব্যাখ্যা করে।	১০,১১,১২,১৩,১৪
		• প্রস্তরযুগ ও তাম্র-প্রস্তরযুগের অর্থ ও তথ্য বলে তৎকালীন মানবজীবনের পরিবর্তনগুলি সমাজে যে প্রভাব ফেলেছিল তা ব্যাখ্যা করে।	১০,১১,১৩,১৪,১৫
		ক) প্রস্তর যুগের অর্থ ব্যাখ্যা করে এবং মানচিত্রে প্রস্তরযুগের স্থানগুলি দেখায়।	১০,১১,১৫
		খ) প্যালিও লিথিক যুগ, মেসোলিথিক যুগ এবং নিওলিথিক যুগ সম্পর্কে তুলনা ও তথ্য প্রদান করে।	১১,১২,১৩,১৪,১৫
		ঘ) তাম্রযুগের অর্থ ব্যাখ্যা করে।	১১,১২,১৩,১৪,১৫
		ঙ) চালকোলিথিক যুগে মহারাষ্ট্রের সাভালদা, জোর্ভে, ইনামগাঁও, দয়ামাদাবাদ প্রভৃতি স্থান মানচিত্রে দেখিয়ে তাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে।	১৩,১৪,১৫
		চ) তাম্রযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে।	১৩,১৪,১৫
		• মানব সমাজের বিকাশের এই বিভিন্ন স্তরগুলি বুঝে নিয়ে মানব-বসতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কালক্রমে ঘটা বিভিন্ন পরিবর্তনের মানব সমাজের উপর পড়া প্রভাব বিশ্লেষণ করে।	৮,৯,১০,১১,১২, ১৩, ১৪,১৫

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG – ২. মানব সংস্কৃতিতে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার হদিস কিছু নির্দিষ্ট উদাহরণ ও তাদের প্রসঙ্গ এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সাহায্যে খোঁজা।			
৩	হরপ্পা সংস্কৃতি C– ২.১ অতীতের প্রধান পরিবর্তনগুলি এবং সমাজে তাদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিশ্লেষণ করে।	• প্রাচীন কালপর্বের হরপ্পা সংস্কৃতির খনন-স্থানগুলি মানচিত্রে দেখিয়ে জনজীবনের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে এবং হরপ্পা সংস্কৃতির পতনের কারণ বলে। ক) হরপ্পা সভ্যতার কালখন্ড সম্পর্কে জানায়। খ) মানচিত্রে হরপ্পা সভ্যতার স্থানসমূহ এবং সমসাময়িক বিশ্ব সভ্যতার স্থানসমূহ দেখায়। গ) হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মানুষের জীবনের পরিবর্তনগুলি ব্যাখ্যা করে। ঘ) হরপ্পা সভ্যতায় পতনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে।	১৬,১৭,১৮,১৯,২০, ২১,২২,২৩,২৪,২৫ ১৭,২৪ ১৭,১৮,২৫ ১৮,১৯,২০,২১, ২২,২৩,২৪
৪	বৈদিক সংস্কৃতি C– ২.১ অতীতের প্রধান পরিবর্তনগুলি এবং সমাজে তাদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিশ্লেষণ করে।	• বৈদিক সংস্কৃতির সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটা পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। ক) বৈদিক সাহিত্য কর্মগুলির উল্লেখ করে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেগুলির ব্যাখ্যা করে। খ) বৈদিক যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতি জীবন এবং আশ্রম ব্যবস্থা ইত্যাদী সম্পর্কে তথ্য বলে।	২৬,২৭,২৮,২৯, ৩০,৩১,৩২ ২৭,২৮,২৯,৩০, ৩১,৩২ ২৮,২৯,৩০,৩১,৩২
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG –৭ ক) ভারতের সমৃদ্ধ অতীত ও বর্তমান, তার গৌরবময় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুত্ববাদ (Pluralism), ঐতিহ্য, পরম্পরা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং মানবজাতির প্রতি অন্যান্য অবদানসহ জানা। খ) ভৌগোলিক বৈচিত্র্য থাকলেও ঐক্যের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মাধ্যমে ভারতীয় হওয়ার অর্থ ও গুরুত্বের বোধ করা।			
৫	বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা C– ৭.৩ ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং তার সাংস্কৃতিক উপাদানের মাধ্যমে বিশ্বে পড়া প্রভাব জানে।	• প্রাচীন কালপর্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাদের পোশাক, জীবনযাত্রা, জীবনধারা, আচরণ, সংস্কৃতি, পরম্পরা, শিক্ষা, পেশার পরিচয় নেয়। ক) প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রভাব বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবদান ব্যাখ্যা করে। খ) প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় ধারা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।	৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭ ৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২ ৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭ ৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২ ৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭ ৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG – ৪ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলির কার্যাবলি সমাজে যে প্রভাব ফেলে, ব্যক্তি ও সামগ্রিক সংস্থা সমাজকে কীভাবে রূপ দেয় তা বোঝা।			
৬	জনপদ ও মহাজনপদ C– ৪.১ শিক্ষার্থী পরিবেশের বা প্রদেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থার কার্যাবলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে, সেই তথ্য পরিচালনা করে এবং তার অর্থ নির্ণয় করে। মানব সমাজের জন্য তার গুরুত্ব চেনে।	• বৈদিকোত্তর যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর কার্যাবলি জীবনের তথ্য সংকলন করে মানব সমাজের উপর কি প্রভাব ফেলেছিল তার গুরুত্ব বলে। ক) বৈদিকোত্তর যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাণের তথ্য সংকলন করে সমকালীন মানবী জীবনের গুরুত্ব বলে। খ) প্রাচীন ভারতের জনজীবনের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব উদাহরণসহ বলে। গ) প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন মহাজনপদের প্রদত্ত অবদানের সাথে বর্তমানের তুলনা করে।	৪৩,৪৪,৪৫,৪৬,৪৭, ৪৮ ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬,৪৭, ৪৮ ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬,৪৭, ৪৮ ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬,৪৭, ৪৮ ৪৫,৪৮
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG – ৪ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলির কার্যাবলি সমাজে যে প্রভাব ফেলে, ব্যক্তি ও সামগ্রিক সংস্থা সমাজকে কীভাবে রূপ দেয় তা বোঝা।			
৭	মৌর্যকালীন ভারত C– ৪.২ সাধারণভাবে ব্যক্তি/ দল/সম্প্রদায় / সমাজের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংস্থার প্রভাব মূল্যায়ন করে।	১) প্রাচীনকালের বিভিন্ন সাম্রাজ্য, ব্যক্তি, সমাজ তৎকালীন সমাজে যে প্রভাব ফেলেছিল তার মূল্যায়ন করে। ক) মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও সম্রাট বিন্দুসারের অবদান ব্যাখ্যা করে। খ) সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ অভিযানের তথ্য ও পরিণতি বলে এবং মূল্যায়ন করে। গ) সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধ, ধর্মপ্রচার ও জনকল্যাণমূলক কাজের অবদান বলে। ঘ) সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচারের কাজ বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করে। ঙ) সম্রাট অশোকের জনকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব বলে। চ) মৌর্যকালীন রাজ্যব্যবস্থা ও জনজীবনের তথ্য বলে। ছ) মৌর্যকালীন শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের তথ্য বলে এবং ভারতের জাতীয় প্রতীক ও মৌর্যকালীন স্থাপত্যকলার মধ্যে সম্পর্ক বলে।	৪৯,৫০,৫১,৫২,৫৩ ৫৪,৫৫,৫৬ ৪৯,৫০,৫১,৫২, ৫৫,৫৬ ৫২,৫৩,৫৫,৫৬ ৫২,৫৩,৫৫,৫৬ ৫২,৫৩,৫৫,৫৬ ৫৩,৫৫,৫৬ ৫৩,৫৪,৫৫,৫৬ ৫৪,৫৫,৫৬

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG –৩ বিভিন্ন সামাজিক ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রসঙ্গের কারণ ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজা এবং তাদের মানবজীবনের সামগ্রিক পরিণতির সাথে যুক্ত করা। CG – ৭ ক) ভারতের সমৃদ্ধ অতীত ও বর্তমান, তার গৌরবময় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুত্ববাদ (Pluralism), ঐতিহ্য, পরম্পরা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং মানবজাতির প্রতি অন্যান্য অবদানসহ জানা। খ) ভৌগোলিক বৈচিত্র্য থাকলেও ঐক্যের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মাধ্যমে ভারতীয় হওয়ার অর্থ ও গুরুত্বের বোধ থাকা।			
৮	**প্রাচীন ভারত ও মহারাষ্ট্রের রাজ্য ও রাজবংশ** C–৭.৪ প্রাচীন ভারত ও মহারাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ও রাজবংশের পরিচয় নেয়।	• প্রাচীন ভারত ও মহারাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ও রাজবংশ (শুঙ্গ, কণ্ব, সাতবাহন, কুষাণ, গুপ্ত, বর্ধন প্রভৃতি)-এর অবদান ব্যাখ্যা করে।	৫৭,৫৮,৫৯,৬০, ৬১, ৬২,৬৩,৬৪
		ক) শুঙ্গ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা করে এবং গ্রিক রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে এর নীতি বিশ্লেষণ করে।	৫৭,৬৩,৬৪
		খ) কণ্ব সাম্রাজ্যের বিস্তার ব্যাখ্যা করে।	৫৮,৬৩,৬৪
		গ) প্রাচীন মহারাষ্ট্রের ও ভারতের সাতবাহন রাজবংশের উল্লেখযোগ্য অবদান ব্যাখ্যা করে।	৫৯,৬৩,৬৪
		ঘ) ইন্দো-গ্রিকদের ভারতীয় মুদ্রা নির্মাণ নবীন ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ব্যাখ্যা করে।	৫৮,৬৩,৬৪
		ঙ) শক সাম্রাজ্যের বিস্তার ব্যাখ্যা করে।	৫৯,৬৩,৬৪
	C–৩.২ নিজেদের অঞ্চলে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে সামাজিক গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংখ্যাতের কারণসমূহ এবং মানব সমাজের উপর তার প্রভাব সনাক্ত করে।	চ) কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তার, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং তাদের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা করে।	৬০,৬৩,৬৪
		ছ) গুপ্ত যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় ব্যাখ্যা করে।	৬১,৬৩,৬৪
		জ) সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য বিস্তারে অবদান ব্যাখ্যা করে।	৬২,৬৩,৬৪
		ঝ) কুষাণদের শাসনকাল ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান ব্যাখ্যা করে।	৬০,৬১,৬৪
		ঞ) বিদেশী আক্রমণের কালে ভারতীয় যুদ্ধনীতি, খাদ্যাভ্যাস, রাজিনীতি ও ঐতিহ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার প্রভাব ব্যাখ্যা করে।	৫৭,৫৮,৬০
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG –৭ ক) ভারতের সমৃদ্ধ অতীত ও বর্তমান, তার গৌরবময় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুত্ববাদ (Pluralism), ঐতিহ্য, পরম্পরা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং মানবজাতির প্রতি অন্যান্য অবদানসহ জানা। খ) ভৌগোলিক বৈচিত্র্য থাকলেও ঐক্যের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মাধ্যমে ভারতীয় হওয়ার অর্থ ও গুরুত্বের বোধ থাকা।			
৯	**প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** C–৭.১ ভারতীয় সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান, ভাষা, শিল্প, দার্শনিক ধারণা, মূল্যবোধ, পোশাক, খাদ্য, পরম্পরা, উৎসব, বাণিজ্য, আয়ুর্বেদ ও যোগ এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভ্যাসগুলির মধ্যে সাদৃশ্য চিনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ব্যাখ্যা করে।	১) প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি বুঝে তার মধ্যে সাদৃশ্য চিনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ব্যাখ্যা করে।	৬৯,৭০
		ক) প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের ভাষা, শিল্প, পরম্পরা, পোশাক, খাদ্য প্রভৃতি উপাদানের তথ্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করে।	৬৫,৬৬,৬৭,৭২,৭৩
		খ) প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের বাণিজ্য ও কারবারের উপাদানের তথ্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করে।	৬৯
		গ) প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রের আয়ুর্বেদ ও যোগ এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভ্যাসগুলির তথ্য শ্রেণীবিভাগসহ ব্যাখ্যা করে।	৬৯,৭০,৭২
		ঘ) প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক উপাদানের মিল ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য উদাহরণসহ বলে।	৭০,৭১
	C–৭.৩ ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং তার সাংস্কৃতিক উপাদানের মাধ্যমে বিশ্বে পড়া প্রভাব জানে।	১) প্রাচীন কালপর্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাদের পোশাক, জীবনযাত্রা, জীবনধারা, আচরণ, সংস্কৃতি, পরম্পরা, শিক্ষা, পেশার পরিচয় নেয়।	৭০,৭১,৭২,৭৩
		ক) ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তথ্য সংগ্রহ করে বুঝে নেয়।	৭১,৭২,৭৩
		খ) প্রাচীন ভারতীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও উন্নত ছিল এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করে।	৬৯
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG – ২ মানব সংস্কৃতিতে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার হদিস কিছু নির্দিষ্ট উদাহরণ ও তাদের প্রসঙ্গ এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সাহায্যে খোঁজা। CG ৩. বিভিন্ন সামাজিক ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রসঙ্গের কারণ ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজা এবং তাদের মানবজীবনের সামগ্রিক পরিণতির সাথে যুক্ত করা।			
১০	**প্রাচীন ভারত ও বিশ্ব** C– ২.২ মানবজীবনের বিশিষ্ট সম্পর্ক, রীতিনীতি ও কার্যাবলি, সমাজের বড় পরিবর্তনগুলি টিকে থাকে। এমন বিশিষ্ট বিষয়গুলির প্রসারের উপাদান চেনে।	১) মানবজীবনের বিশিষ্ট সম্পর্ক, রীতিনীতি ও কার্যাবলি, সমাজের বড় পরিবর্তনগুলি টিকে থাকে তা বলে এবং পারস্য ও গ্রিক সংস্কৃতির মিলনের উপাদানগুলি বলে।	৭৪,৭৫
		ক) পার্সীয়ান সংস্কৃতির ভারতীয় সমাজে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব ব্যাখ্যা করে।	৭৪,৭৫,৭৬
		খ) গ্রিক সম্পৰ্কীয় ভারতের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব ব্যাখ্যা করে।	৭৬,৭৭
	C–৩.২ সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে, তাদের প্রদেশে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে সামঞ্জস্য ও সংঘাতের পিছনের কারণ এবং মানব সমাজে তাদের প্রভাব চেনে।	২) আমাদের চারপাশের মানবজীবনের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে অনেক প্রাচীন সংস্কৃতির পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও বিভিন্ন প্রদেশের পারস্পারিক সামঞ্জস্য, সংঘাত বুঝে নিয়ে মানবজীবনে তাদের দ্বিমুখী প্রভাব ব্যাখ্যা করে।	৭৮,৮০,৮১
		ক) ভারত ও প্রতিবেশী দেশের পারস্পারিক সম্পর্ক স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে।	৭৮,৭৯,৮১
		খ) ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ইরাণ ও গ্রিসের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, যোগাযোগ প্রশাসনিক ও শৈক্ষণিক ক্ষেত্রে যে প্রভাব পড়েছিল তা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে।	৮০,৮১
		গ) আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা ব্যাখ্যা করে।	৭৬,৭৭,৮১

শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সময়ে

- জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যের সমস্ত শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-নিষ্পত্তি উন্নত করা। তাই পাঠ্যপুস্তকের প্রারম্ভে প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষণ-নিষ্পত্তিগুলি সকলে পাঠদানের সময়ে অবশ্যই সামনে রাখবেন।
- প্রতিটি পাঠের শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করার সময়ে শিক্ষণ-নিষ্পত্তি অনুযায়ী পাঠের শিক্ষণ-অভিজ্ঞতাগুলি ও বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করতে হবে।
- পাঠগুলিতে বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন শিক্ষণ-অভিজ্ঞতার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এর সামূহিক বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের সাহায্যে একাত্মিক পদ্ধতিতে সহজে শিখতে পারবে, এই বোধ তৈরি করতে হবে।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শিক্ষার্থীদের পড়ানোর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীরা যেন আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পায় এবং এর মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও জাতীয় একাত্মতাবোধ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকেরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়টি পড়ানোর সময়ে এই উদ্দেশ্য মনে রেখে অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করবেন।
- বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিষয়ের বোঝাপড়া বাড়ানো যাবে।
- বিষয়বস্তুর বোঝা যেন না বাড়ে তার জন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য উদাহরণ ও ব্যাখ্যাসহ দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষকেরা পাঠদানের আগে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য যথাস্থানে দেওয়া দরকার।
- আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ থেকে তৈরি হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন বস্তু, মুদ্রা, প্রাচীন স্থাপত্যের নমুনা সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য পাওয়ার উপকরণ কী কী, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের বাইরে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে।
- হরপ্পা সংস্কৃতির সময় থেকেই ভারতের দূরদেশের সাথে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির মূলে ছিল, এটা মনে রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বরূপ শিক্ষার্থীদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই ধরনের বাণিজ্য বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য ছাড়া সম্ভব হয় না, এটি শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে আনতে হবে।
- রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ায় নৃত্যনাট্যের আকারে উপস্থাপনার পরম্পরা আজও বেঁচে আছে। সেখানকার প্রাচীন ভাস্কর্যেও সেগুলির কাহিনী অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। এ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করে তা শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করতে পারে, এর জন্য শিক্ষার্থীদের প্রকল্প দিতে হবে।
- নাগরিকশাস্ত্র বিষয়টি শুরু করার আগে আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন, ঘটক রাজ্য শাসন এবং স্থানীয় শাসনের স্বরূপ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- ভারতের খাদ্য-বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য 'আমাদের সমাজজীবন' পাঠে ভারতের স্থূল মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- স্থানীয় শাসন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের আলাদা আইন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সেই আইনগুলির বিস্তারিত তথ্য দেওয়া প্রয়োজনীয় নয়, তবে আমাদের দেশের শাসন সংবিধান, আইন ও বিধি মেনে চলে এটি তাদের অবশ্যই বলতে হবে। আইনের শাসন যে বিদ্যমান, তা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তাদের দেখিয়ে দিতে হবে।
- ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর ফলে স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির সবলীকরণ হয়েছে, এই বিষয়টি মনে রেখে স্থানীয় শাসন সংস্থায় ঘটা পরিবর্তনগুলি শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।
- স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের অংশগ্রহণের ফলে ঘটা পরিবর্তনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- ব্রিটিশ শাসনকালে স্থানীয় শাসনকে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা' বলা হত। স্বাধীনতার পর সর্বস্তরে স্বরাজ থাকায় এখন 'স্থানীয় শাসন সংস্থা' বলা হয়।
- শিক্ষকের জন্য: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রক্রিয়ার সময়ে সাঙ্কেতিক ভাষা (Sign Language) এবং অন্যান্য সহায়ক শিক্ষণশাস্ত্রীয় পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যেভাবে সম্ভব সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে।

সূচীপত্র

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	ইতিহাসের উপকরণ	১
২	প্রাগৈতিহাসিক কাল	৮
৩	হরপ্পা সভ্যতা	১৬
৪	বৈদিক সংস্কৃতি	২৬
৫	বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা	৩৩
৬	জনপদ ও মহাজনপদ	৪৩
৭	মৌর্যকালীন ভারত	৪৯
৮	প্রাচীন ভারত ও মহারাষ্ট্রের রাজ্য ও রাজবংশ	৫৭
৯	প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার	৬৫
১০	প্রাচীন ভারত ও বিশ্ব	৭৪

১ ইতিহাসের উপকরণ

১.১ ইতিহাসের সংযোজন
১.২ ভৌতিক উপকরণ
১.৩ লিখিত উপকরণ
১.৪ মৌখিক উপকরণ
১.৫ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস
১.৬ মহারাষ্ট্রের বস্তুসংগ্রহালয় ও ঐতিহ্যস্থল

আমাদের দেশের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু সেটা আমরা কীভাবে জানতে পারলাম ? আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন করে থাকতো ? তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো, তাঁদের সংস্কৃতি, সমাজ এবং রাজ্যব্যবস্থার অধ্যয়ন কীভাবে করা হয় ?

এরকম প্রশ্ন কি তোমাদের মনে কখনো এসেছে ? তোমাদের মনে আসা প্রশ্নগুলো লেখো ।

কল্পনা করো।

তোমরা একটা কেল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। হঠাৎ মাটিতে একটা মুদ্রা খুঁজে পেলে, অথবা একটা দেওয়ালে লেখা খোদাই করা দেখলে, একটা গাছের গোড়ায় লুকিয়ে থাকা মাটির পাত্রের টুকরো দেখতে পেলে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে এটা কোন যুগের ? এর মানেটা কী ? এই জিনিসগুলো আমাদের অতীত সম্পর্কে কোন কথা বলছে ?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতেই আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন উপকরণের অধ্যয়ন করি।

এটাই সেই জাদুর চাবিকাঠি, যার সাহায্যে হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষদের জীবনে উঁকি মেরে দেখা সম্ভব হয়।

পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা এই বিষয়ে তথ্য পেয়েছ। ইতিহাসে আমরা যা কিছু পড়ি, সেই ইতিহাস প্রমাণের ভিত্তিতে লেখা হয়। যেসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই বিষয়গুলোই ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের উৎস।

১.১ ইতিহাসের সংযোজন

ইতিহাসের সংযোজন মানে হলো টুকরো টুকরো করে একটা ধাঁধা মেলানোর মতো। অতীতকালের মুদ্রা, শিলালিপি, চিত্র, মাটির পাত্র এইরকম অনেক বস্তু যেন সেই ধাঁধার ছোট ছোট টুকরো। যখন ঐতিহাসিকরা এই টুকরোগুলো ঠিকমতো জোড়া লাগায়, তখন আমাদের অতীতের একটা সুন্দর ছবি তৈরি হয়।

গবেষণার উৎসের ভিত্তিতে আমরা অতীতের ঘটনা, চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারি। এই উৎসগুলোকে প্রাথমিক উপকরণ, গৌণ উপকরণ এবং মৌখিক উপকরণ এভাবে ভাগ করা হয়।

আমাদের পূর্বপুরুষদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র, খোদাই করা লেখ, নির্মিত স্থাপত্য, সেই যুগের আচার-আচরণ, ঐতিহ্য, লোককলা, লোকসাহিত্য, ঐতিহাসিক দলিলপত্র এই বিভিন্ন উপকরণ থেকে আমরা আমাদের ইতিহাস খুঁজে বের করতে পারি। এই সবকিছুকে একসাথে ‘ইতিহাসের উপকরণ’ বলা হয়।

প্রাথমিক উপকরণ	গৌণ উপকরণ	মৌখিক উপকরণ
এই উপকরণগুলি সরাসরি সংশ্লিষ্ট যুগের।	এই উপকরণগুলিতে প্রাথমিক উপকরণ অধ্যয়ন করে তথ্য দেওয়া হয়।	এই উপকরণগুলিতে অতীতের ঘটনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বা অভিজ্ঞতা মুখে মুখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত থাকে।
উদাহরণ : শিলালিপি, তাম্রফলক, মুদ্রা, মূল দলিলপত্র (ভোজ পত্র, চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র ইত্যাদি) প্রাচীন জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন স্থাপত্য, মন্দির ইত্যাদি।	উদাহরণ : ইতিহাস বিষয়ক বই, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, তথ্যচিত্র গবেষণাপত্র, বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা, বিশ্বকোষ ইত্যাদি।	উদাহরণ : লোককথা, কিংবদন্তি, লোকগীত, পোওয়াড়া, (বীরগাথামূলক গান), লোকনাট্য, কীর্তন ইত্যাদি। বীরগাথা, গ্রামবাসী ও বয়ো - জ্যেষ্ঠদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ব্যবসায়ী বা সৈনিকদের বলা কথা।
গুরুত্ব : এই উপকরণ গুলি ইতিহাস লেখার সময় সেই যুগের যথাযথ তথ্য প্রদান করে।	গুরুত্ব : এই উপকরণগুলি থেকে ইতিহাসের সুসংগত তথ্য পাওয়া যায়। এই উপকরণগুলি গবেষকরা বিশ্লেষণ করে তৈরী করেন।	গুরুত্ব : লিখিত প্রমাণ না থাকা যুগের লোকজীবন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বোঝার জন্য মৌখিক উপকরণ কাজে লাগে।

১.২ ভৌতিক উপকরণ

করে দেখো।

তোমাদের বাড়ির প্রাচীন জিনিসপত্র তোমাদের বাড়ির বা পরিবারের ইতিহাস বলে। উদাহরণ স্বরূপ, ফটো সংগ্রহ, কোনো প্রাচীন পাত্র, কোনো ছবি বা ঠাকুরমার তুলে রাখা শাড়ি এই সব একটা বাক্সে সংরক্ষণ করে রাখো। একে আমরা ঐতিহ্যর বাক্স বলব। এই জিনিসগুলো কোন ইতিহাস বলে, সেটা শ্রেণীকক্ষে বলো।

এই জিনিসপত্রগুলোই হলো ইতিহাসের ভৌতিক উপকরণ। **ভৌতিক উপকরণ মানে হলো যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পারি এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি।** এই উপকরণগুলোর ব্যবহার ইতিহাসের অধ্যয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **ভৌতিক উপকরণগুলো সেই যুগের মানুষদের জীবন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, খেলাধুলা, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে তথ্য দেয়। এই উপকরণগুলো ইতিহাস গবেষণায় প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।** প্রাচীন কালে মানুষ যে সব বস্তু ব্যবহার করত, সেগুলোর অনেক কিছু আজও পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে শিলালিপি, তাম্রফলক, প্রাচীন মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, পাত্র, পাথর বা ধাতুর মূর্তি, প্রাচীন ইমারত, কেল্লা, মন্দির, জলাশয় ইত্যাদি। এই সবই ভৌতিক উপকরণ। এই উপকরণগুলো আজও পুরাতাত্ত্বিক

ভৌতিক উপকরণ

সংগ্রহালয় ও ঐতিহাসিক স্থানে দেখতে। পাওয়া যায়। খননকার্যে প্রাপ্ত মাটির পাত্রের টুকরো, তার জন্য ব্যবহৃত মাটি, তার উপরের লেপ ও রঙিন নকশা বা শিল্পকর্ম থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায় যে এই পাত্রগুলো কোন যুগের এবং কী কাজে ব্যবহার হতো। শস্য, ফলের বীজ ও পশুর হাড়ের অবশেষ থেকে সেই সেই যুগের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানা সম্ভব। খোদাই করা শিলালিপি তৎকালীন প্রশাসন, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে তথ্য দেয়। সেই যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতিরক্ষা প্রাচীর, রাজ প্রাসাদ, প্রাচীন স্থাপত্যের অধ্যয়ন করলে সেই যুগের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, যুদ্ধপদ্ধতি ও স্থাপত্যকলার তথ্য পাওয়া যায়। তেমনি প্রাচীন মুদ্রা বা সিলমোহর থেকে সেই যুগের অর্থনীতি, শাসকদের নাম, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলার উপর আলোকপাত করা হয়। অর্থাৎ ভৌতিক উপকরণগুলো সেই যুগের মানব-জীবনের ইতিহাস বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ লিখিত উপকরণ

লেখার আকারে যে উপকরণগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোকে আমরা লিখিত উপকরণ বলি। এই লিখিত উপকরণগুলো থেকে সেই যুগের ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক নীতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় ও সামাজিক মতাদর্শ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

প্রস্তর যুগে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ লেখার বিদ্যা জানত না। সেই যুগের তথ্য আমরা ভৌতিক উপকরণের সাহায্যে জানতে পারি। কিন্তু যতই মানুষের বোধশক্তি ও ভাষা বিকশিত হতে লাগল, ততই তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও তথ্য চিত্র এবং চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করল। এটাই ছিল লেখনকলার সূচনা। পরে লেখার পদ্ধতি বিকশিত হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

তোমরা জানো কী ?

ইতিহাস লেখার জন্য যে যুগের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই যুগকে আমরা ঐতিহাসিক যুগ বলে জানি। যে যুগে লিপির উদ্ভব ও বিকাশ হয়নি, সেই যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়।

প্রাচীন কালে ব্যবসায়ী, পর্যটক, রাজা ও পণ্ডিতেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, ঘটনা বা আদেশের নথি রেখে গিয়েছিলেন। লিখিত উপকরণগুলো থেকে আমরা সেই যুগের লিপি, ভাষা, লেখার ধরন এবং মানুষের আচার-বিচার, ঐতিহ্য ও জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য পাই। সেগুলোর কালনির্দেশের ভিত্তিতে যুগের তথ্য পাওয়া যায়। এই উপকরণগুলোর সাহায্যে ঐতিহাসিকরা বিশ্লেষণ করে সেই সেই যুগের ইতিহাস লেখেন। বিভিন্ন সংগ্রহালয়, গ্রন্থাগার ও মন্দিরে প্রাচীন কালের লিখিত উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়।

করে দেখো।

তোমাদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বা পরিবারের অন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলো। তাঁদের ছেলেবেলার স্মৃতি, তাঁদের গ্রামের অথবা শহরের কথা, উৎসব-পার্বণ, তাঁরা যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। সেসব জেনে নাও এবং তোমাদের নোটবুকে লিখে রাখো। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে ইতিহাস কতটা জীবন্ত ও মজার!

১.৪ মৌখিক উপকরণ

মৌখিক উপকরণ মানে জনশ্রুতি বা মুখে মুখে প্রচলিত তথ্য। সেটা সমাজের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে। এর মধ্যে রয়েছে লোককথা, কিংবদন্তি, পরিচিতি, পোওয়াড়া (বীরগাথামূলক গান), প্রবাদ, লোকগীত। কখনো কখনো মৌখিক আকারে কোনো সমাজের ইতিহাস, জীবনযাত্রা, সামাজিক ঘটনা, উৎসব-পার্বণের বর্ণনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত থাকে। কোনো কোনো কিংবদন্তি কাল্পনিক হলেও, তার পেছনে কিছু না কিছু সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ লুকিয়ে থাকে। ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও সমষ্টির চিন্তাভাবনা গড়ে তোলায় মৌখিক ঐতিহ্যের অংশগ্রহণ থাকে। তাই ইতিহাসের অধ্যয়নে মৌখিক উপকরণ ব্যবহার করার সময় ঐতিহাসিকরা সেই বিষয়গুলো যাচাই করে, তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিচার করেন এবং অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে ইতিহাস লেখায় তার ব্যবহার করেন।

১.৫ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণ

প্রাচীন যুগ বলতে বোঝায় প্রস্তর যুগ থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্তের যুগ। প্রস্তর যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে প্রাপ্ত ভৌতিক উপকরণের উপর নির্ভরশীল। তারপরের যুগের ইতিহাস বোঝার জন্য লিখিত উপকরণ অত্যন্ত বেশি কাজে আসে।

ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন উপকরণ হলো বেদ। শুরুতে বেদ লিখিত আকারে ছিল না, সেগুলো মুখস্থ করার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতীয়রা বিকশিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে বেদের লিখিত রূপ তৈরি হয়। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই চারটি বেদে দেবতাদের স্তুতি, যজ্ঞবিধি ও সামাজিক জীবনের তথ্য পাওয়া যায়। বেদের পরে ব্রাহ্মণগ্রন্থ, আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পরিচয় এই গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে পাওয়া যায়। তেমনি রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্যগুলোও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ।

খুঁজে দেখো।

সঙ্গম সাহিত্য হলো তামিল ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য। এই বিষয়ে তথ্য খুঁজে বের করে লিখো।

প্রাচীন ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিতে প্রচুর লিখিত সাহিত্য তৈরি হয়েছিল। ত্রিপিটক নামে পরিচিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা, ভিক্ষুদের জন্য নিয়মাবলি ও দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থগুলো পালি ভাষায় লেখা। জৈন ধর্মের গ্রন্থ আগম সাহিত্যে বর্ধমান মহাবীরের শিক্ষা ও অহিংসার গুরুত্বের বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থগুলো অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় লেখা। এই ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি কিছু গ্রন্থ প্রশাসন, নীতিনিয়ম ও আইন এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত ছিল। লেখা তথ্য শুধু গ্রন্থেই থাকে না, বরং তা পাথরে, তাম্রফলকে ও দেওয়ালেও খোদাই করা থাকে। সম্রাট অশোক অনেক শিলালিপি তৈরি করে ধর্মনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত তাঁর বিচারধারা প্রজাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই লেখাগুলো প্রধানত ব্রাহ্মী লিপিতে খোদাই করা। তার মধ্যে কিছু লেখা খরোষ্ঠী ও আরামাইক লিপিতেও খোদাই করা আছে। তেমনি জমি দান ও করমুক্তি সংক্রান্ত আদেশ তাম্রফলকে খোদাই করে রাখা হতো। এই নথিগুলো থেকে প্রশাসনের তথ্য জানা যায়।

করে দেখো।

তোমাদের, তোমাদের বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সদস্যদের নাম পাশে দেওয়া তালিকার সাহায্যে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখো।

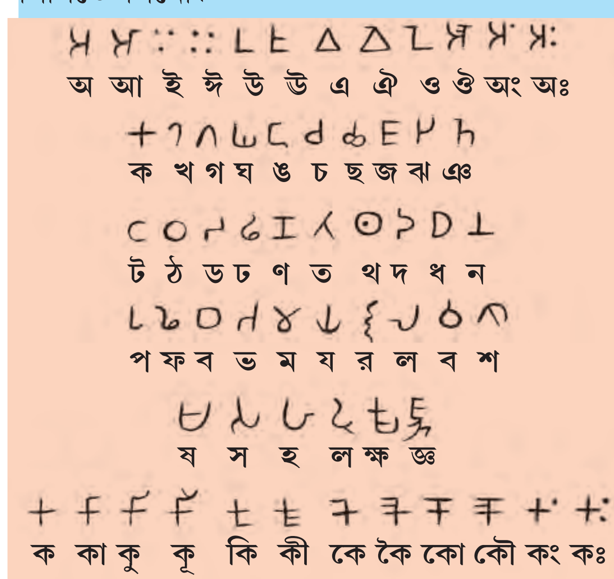

প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিদেশি পর্যটকদের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্তও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা এখানে দেখা শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মীয় জীবন, লোকজীবন ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এর ফলে আমরা সেই যুগে ভারতীয়দের জীবন কেমন ছিল তা জানতে পারি।

১.৬ মহারাষ্ট্রের বস্তুসংগ্রহালয় ও ঐতিহ্যস্থল

■ মহারাষ্ট্রের বস্তুসংগ্রহালয়

ইতিহাস বিষয়ক বস্তুসংগ্রহালয়ে ইতিহাসের উপকরণগুলো সংগৃহীত ও প্রদর্শিত করা হয়। মহারাষ্ট্রে অনেক প্রসিদ্ধ বস্তুসংগ্রহালয় আছে। সেখানে আমরা প্রাচীনকালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, চিত্রকলা, মূর্তি, হস্তলিখিত পুঁথি, পোশাক, হস্তশিল্প ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বস্তু দেখতে পাই। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বস্তুসংগ্রহালয়, মুম্বই - এটি বিখ্যাত। এখানে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক বস্তু সংগৃহীত রয়েছে। পুণেতে ডেকান কলেজ স্নাতকোত্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বস্তুসংগ্রহালয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। রাজা দিনকর কেলকর সংগ্রহালয়ে বিভিন্ন গৃহস্থালির সামগ্রী, গহনা, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক ও শিল্পকর্মের গ্যালারি রয়েছে। সেগুলো আগেকার যুগের মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় করিয়ে দেয়। নাগপুরের কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়, ছত্রপতি সম্ভাজীনগরের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ সংগ্রহালয়, কোল্হাপুরের শ্রী ছত্রপতি শাহু সংগ্রহালয় এবং সাতারার শ্রী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ সংগ্রহালয়, নাসিক জেলার ত্র্যম্বকেশ্বরের কাছে অঞ্জনেরীর

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বস্তুসংগ্রহালয়

মুদ্রাবিজ্ঞান সংগ্রহালয় এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসংগ্রহালয়ের কয়েকটি উদাহরণ।

■ মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যস্থল

মহারাষ্ট্র একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী রাজ্য। ইউনেস্কো এই বিশ্বমানের সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যস্থল মহারাষ্ট্রে রয়েছে। সেগুলো আমাদের ইতিহাসের গৌরবময় প্রতীক। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যস্থল হলো অজন্তা ও

অজন্তা গুহা

ইলোরার গুহা। ১৯৮৩ সালে সেগুলো ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মুম্বইয়ের কাছে ঘারাপুরী গুহা (এলিফ্যান্টা কেভস), কানহেরী গুহাও বিখ্যাত।

মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস এই বিশাল রেলস্টেশনটি ব্রিটিশ যুগের ‘গোথিক’ স্থাপত্যশৈলীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৯৯৭ সালে এটি বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হিসেবে ঘোষিত হয়।

‘পশ্চিমঘাট’ নামে পরিচিত মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পর্বতমালা জৈববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এবং ২০১২ সালে ইউনেস্কো এটিকে প্রাকৃতিক ঐতিহ্যস্থল হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। এখানে অনেক দুর্লভ প্রাণী, পাখি ও উদ্ভিদ পাওয়া যায়। ইউনেস্কো সম্প্রতি ‘মারাঠা মিলিটারি ল্যান্ডস্কেপস’ নামে ১২টি কেল্লাকে বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। এর মধ্যে ১১টি

কেল্লা মহারাষ্ট্রে আছে। জিঞ্জি কেল্লাটি তামিলনাড়ু রাজ্যে। এই কেল্লাগুলো মারাঠা সাম্রাজ্যের সামরিক দক্ষতা, স্থাপত্যকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

মহারাষ্ট্রের এই ঐতিহ্যস্থলগুলো আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক। এই স্থানগুলো ঐতিহাসিক পর্যটনের আকর্ষণ এবং এগুলোর অধ্যয়ন করলে আমাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের গর্ব বৃদ্ধি পায়।

তোমার মত কী ?

ঐতিহ্যস্থলগুলোর সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য। তার জন্য তোমরা কী অবদান রাখবে ?

অনুশীলনী

প্র.১ অ) নীচে দেওয়া বিকল্পগুলোর মধ্যে থেকে সঠিক বিকল্প বেছে নিয়ে বাক্য পূর্ণ করো।

১. বর্ধমান মহাবীরের শিক্ষা .... এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

অ) উপনিষদ ব) ত্রিপিটক

ক) আগম সাহিত্য ড) সঙ্গম সাহিত্য

২. ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন উপকরণ .... হলো।

অ) আরণ্যক ব) বেদ

ক) ব্রাহ্মণগ্রন্থ ড) উপনিষদ

ব) সঠিক জোড়া মেলাও।

দল 'ক'	দল 'খ'
১) লিখিত উপকরণ	অ) লোকগীত
২) ভৌতিক উপকরণ	ব) বিদেশি পর্যটকদের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত
৩) মৌখিক উপকরণ	ক) মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র

প্র.২ অ) ধারণাচিত্র পূর্ণ করো।

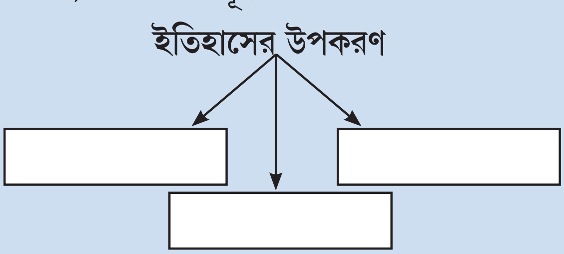

ব) ছবিটি কোন উপকরণ প্রকারের অন্তর্গত তা লিখো।

....

....

....

প্র.৩ অ) নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখো।

১. ইতিহাসের লিখিত ও মৌখিক উপকরণের পার্থক্য স্পষ্ট করো।

২. ভৌতিক উপকরণের নাম লিখে ইতিহাসের অধ্যয়নে তাদের গুরুত্ব লিখো।

৩. আধুনিক যুগের কোন কোন উপকরণ ভবিষ্যতের প্রজন্মকে ইতিহাস বলতে পারবে ? সেগুলো লিখো।

প্র.৪

অ. কোনো প্রাচীন বস্তু যেমন মূর্তি, সিলমোহর, মুদ্রা, পাত্র, গহনা, দলিলপত্র, খেলনা ইত্যাদি থেকে মানবজীবনের পরিবর্তন সম্পর্কে কী তথ্য পাওয়া যায় তা লিখো।

ব. নীচের তালিকা পূর্ণ করো।

শহরের/ স্থানের নাম	বস্তুসংগ্রহালয়ের নাম	বৈশিষ্ট্য
মুম্বই	....	....
....	রাজা দিনকর কেলকর সংগ্রহালয়	....
....	....	মুদ্রাবিজ্ঞান সংগ্রহালয়

কার্যকলাপ -

- উৎসব-পার্বণ সংক্রান্ত লোকগীত, কথা, পোওয়াড়া, ভারুড, ওভী (অনুগীতি), সংগ্রহ করে প্রার্থনা সভায় (পরিপাঠ) উপস্থাপন করো।
- মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যস্থলের ছবির তালিকা তৈরি করো এবং তার সাহায্যে ঐতিহ্যের দেওয়াল তৈরি করো।

প্র.৫ মারাঠা মিলিটারি ল্যান্ডস্কেপস নামে ঘোষিত বারোটি কেল্লার নাম ইন্টারনেটের সাহায্যে খুঁজে বের করো।

সা	লে্হ	র	জ	য়	গ	ড	খাঁ	তুং	গ	ল	অ
কু	কে	অ	ব	চি	ত	গ	ড	দে	ন্হা	র	র্না
লা	ল	ক	সু	ব	র্ণ	দ	র্গ	প	রি	স	ল
বা	না	হ	বং	বা	রু	গ	ড	বা	স্তে	টা	সিং
বি	বি	রি	দ	শী	ভী	সি	মা	ল	ব	ণ	ধু
জ	শা	শ্চং	ন	ব	ব	হ	পা	স	ড	প	দু
য়	ল	দ্র	গ	নে	গ	গ	লি	গ	ভো	র	র্গ
দু	গ	গ	ড	রি	ড	ড	হ	না	দ	গি	রি
র্গ	ড	ড	উং	দে	রি	লো	বা	রু	গ	ড	রা
প্র	তা	প	গ	ড	তো	র	ণা	কাং	গো	রি	য়
ব	স	ই	চা	কি	ল্লা	ক	ম	ল	গ্ন	ড	গ
রা	জিং	জি	সিং	খ	গ	ড	রা	জ	গ	ড	ড়

১. রায়গড়
২. ____
৩. ____
৪. ____
৫. ____
৬. ____
৭. ____
৮. ____
৯. ____
১০. ____
১১. ____
১২. ____

উপক্রম

- তোমাদের গ্রামের কাছে/জেলার কাছে যে সংগ্রহালয় আছে সেটি পরিদর্শন করো। তার প্রতিবেদন লিখো।

***

২ প্রাগৈতিহাসিক কাল

২.১ প্রাচীন ভারত ভৌগোলিক পটভূমি
২.২ প্রাগৈতিহাসিক যুগ
২.৩ মধ্যযুগ থেকে নবাশ্ম/নবপ্রস্তর যুগ
২.৪ তাম্রপ্রস্তর যুগ
২.৫ মহারাষ্ট্রের উৎখনন স্থানসমূহ

ছাত্রছাত্রীরা, একটু চোখ বন্ধ করো আর কল্পনা করো যে তোমরা এমন একটি সময়ে বাস করছ যেখানে কোথাও মোবাইল নেই, গাড়ি নেই, খেলনা নেই, এমনকি ঘর, গ্রাম, স্কুল, রাস্তা কিছুই নেই!

বলো তো দেখি!

- এই রকম সময়ে তুমি থাকলে, তোমার দৈনন্দিন জীবন কেমন হত?
- তুমি কোথায় থাকতে?
- এই রকম জায়গায় কনকনে ঠান্ডায় উষ্ণতা পেতে তুমি কী করতে?
- রান্না কীভাবে করতে?
- কোনো বন্য পশু তোমার দিকে আসতে দেখলে তুমি কী করতে?

লক্ষ লক্ষ বছর আগে আদিমানবের কালে তাকে ঠিক এই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হত। আজ আমরা যা দেখি, যেসব সুখ-সুবিধা ভোগ করি, সেগুলো পেতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। এই সময়ের পর্যায়গুলিতে যাযাবর অবস্থা থেকে স্থায়ী জীবনের দিকে, জঙ্গল থেকে গ্রামের দিকে এবং ক্রমে উন্নত সভ্যতা পর্যন্ত পৌঁছানোর এক অসাধারণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। চলো, মানবের এই একদম গোড়ার অবস্থা সম্পর্কে ধাপে ধাপে জেনে নেওয়া যাক।

তোমাদের মনে আছে কী?

এর আগে তোমরা মানবের বিবর্তনের পর্যায়সমূহ এবং আদিমানবের জীবন, খাদ্যাভ্যাস, হাতিয়ার, শিল্পকলা ইত্যাদি সম্পর্কে পড়েছিলে। সেখান থেকে তোমাদের কী-কী মনে আছে তা শ্রেণীকক্ষে পুনরাবৃত্তি করো।

২.১ প্রাচীন ভারত ভৌগোলিক পার্শ্বভূমি

মানব ইতিহাসের বিকাশে সেই সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিস্থিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষ যে অঞ্চলে বাস করে, সেখানকার

পর্বত, নদী, আবহাওয়া, মাটি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সেখানকার মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা গড়ে তোলে। কোন ফসল ফলাবে, কোন প্রাণী পালবে, কোথায় বসতি করবে, যাতায়াত কেমন হবে এই সবকিছু সেই সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতে মানব সভ্যতার বিকাশ নানা রূপে ঘটেছে। এর প্রধান কারণ হল ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য।

ভারত একটি বিশাল দেশ এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। উত্তরের ঝড়ো হাওয়া, ঘূর্ণিঝড়, হাড়-কাঁপানো ঠান্ডার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে হিমালয়ের উঁচু উঁচু পর্বতশ্রেণি রক্ষা করে। উত্তর ভারতে আবহাওয়া ঠান্ডা ও শুষ্ক, আর দক্ষিণ ভারতে আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। তাই কৃষির পদ্ধতি, ফসল এবং মানুষের জীবনযাত্রায় পার্থক্য দেখা যায়।

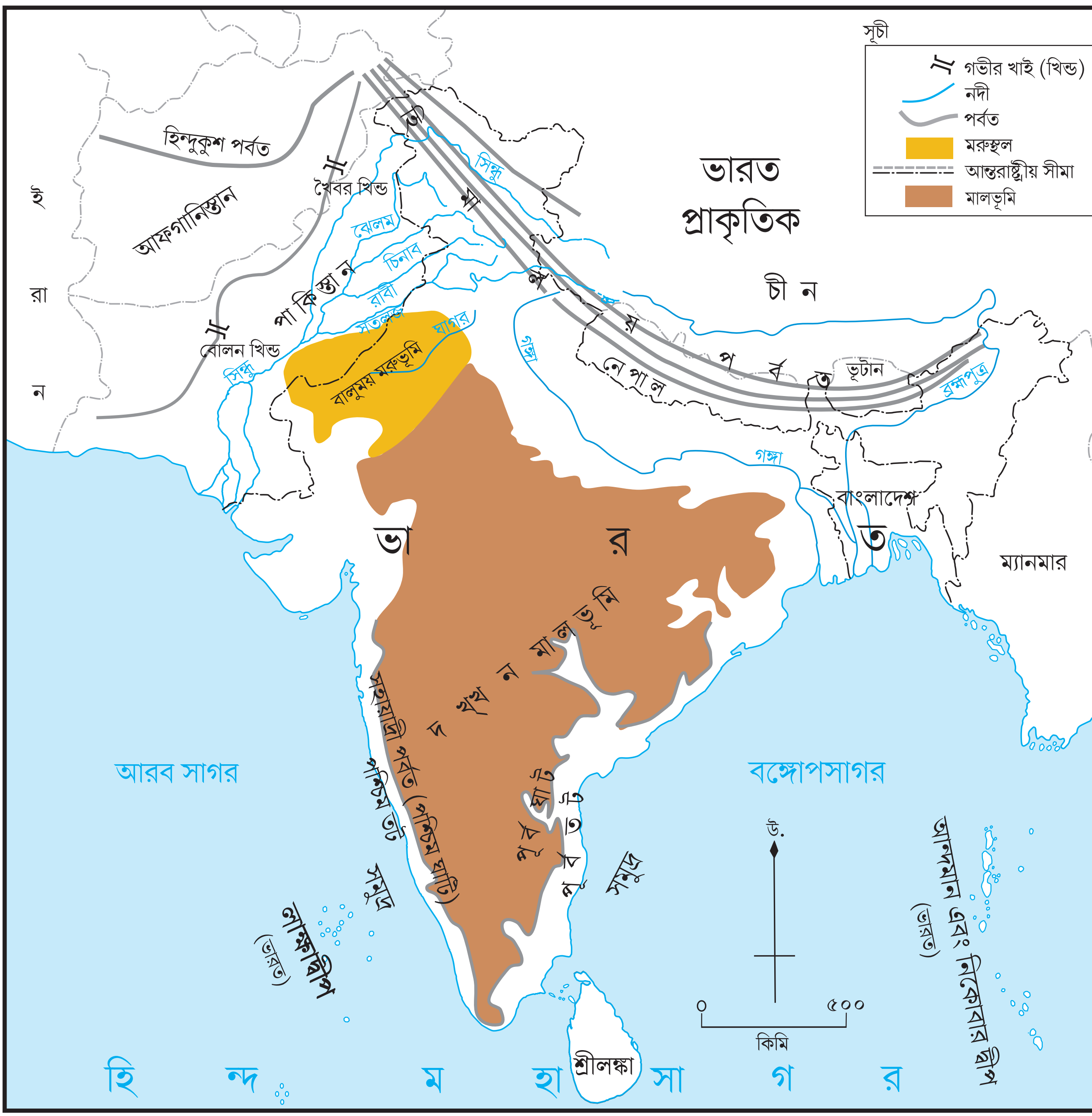

ভারতের নদীগুলির ফলে তৈরি পলিমাটির উর্বর জমিতে প্রাচীন কালে কৃষির বিকাশ হয়েছিল। মধ্য ভারতের বিস্তৃত মালভূমি এবং গঙ্গা-যমুনার দোআব অঞ্চলের সমতলভূমি ভারতের কৃষির জন্য সবচেয়ে অনুকূল ছিল।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় এখানে ধাতুশিল্প, মৃদাশিল্প এবং তাম্রপ্রস্তর সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। প্রাচীন মহারাষ্ট্রের তাম্রপ্রস্তর যুগের বসতি, কৃষি ও জীবনধারার জন্য গোদাবরী, কৃষ্ণার মতো নদী ও তাদের উপনদীগুলি সহায়ক ভিত্তি হয়েছিল।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর থাকায় সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রাচীন কাল থেকেই গতি এসেছিল। এর ফলে দূর-দূরান্তের অঞ্চলের মানুষ ও সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয়দের যোগাযোগ হয়েছিল।

এই বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারতে অনেক সভ্যতা, ঐতিহ্য ও জীবনধারার উদ্ভব হয়েছিল।

২.২ প্রাগৈতিহাসিক যুগ

গত বছর তোমরা পড়েছ যে 'এপ' বানরের কিছু প্রজাতি বিবর্তিত হতে হতে মানবের সৃষ্টি হয়েছে। এই আদিকালের মানবকে 'আদিমানব' বলা হয়।

আদিমানবের জীবন অত্যন্ত কঠিন ছিল। সে যাযাবর অবস্থায় থাকায় সর্বদা খাদ্য, জল, আশ্রয় ও নিরাপত্তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। খাদ্যের জন্য সে শিকার করত। ফলমূল, কন্দমূলসংগ্রহ করত। সেই হাতিয়ারগুলি কাঠ, পাথর বা হাড় দিয়ে তৈরি হত। আদিমানব হাতের ইশারা, বিভিন্ন ধরনের শব্দ বা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে যোগাযোগ করত বলে মনে করা হয়।

এই কালকে **প্রাগৈতিহাসিক কাল** বলে জানা যায়। আগের পাঠে তোমরা জেনেছ যে, যে কালে লিপির উৎপত্তি বা বিকাশ হয়নি, সেই কালকে 'প্রাগৈতিহাসিক কাল' বলে।

এই কালে মানব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছিল। তার জীবন অধ্যয়ন মূলত পাথরের হাতিয়ার, হাড়, মাটির পাত্র, গুহাচিত্র এই প্রমাণগুলির ভিত্তিতে করা হয়। মানবের সরঞ্জামে, জীবনধারায়, খাদ্যাভ্যাসে ও বসতির ধরনে পরিবর্তন হতে থাকে।

মানবের বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়সমূহ –

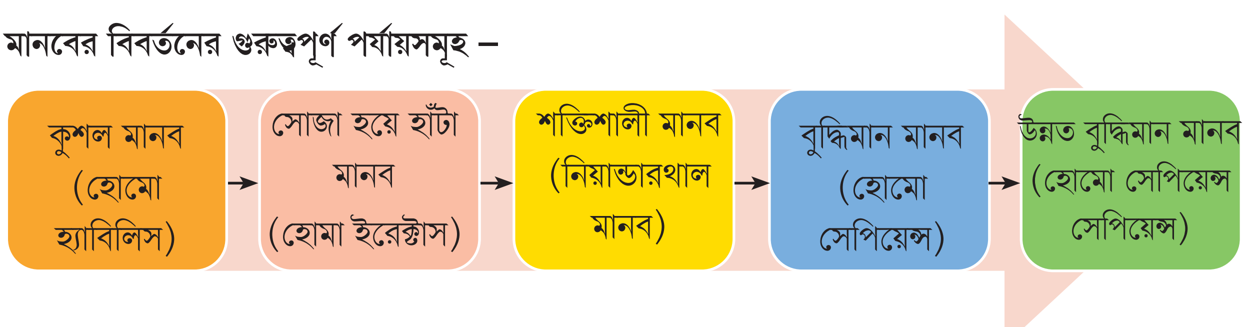

তোমরা জানো কী ?

তোমরা একটি মজার কথা জানো কি ? 'ইয়েতি' হিমালয়ে বসবাসকারী একটি রহস্যময় ও বড় রোমশ প্রাণী বলে একটি কিংবদন্তি আছে। তাকে 'তুষারমানব' বলা হয়। বহুবার এই এলাকায় বড় আকারের পায়ের ছাপ দেখা গেছে বলে কথিত আছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে এই পায়ের ছাপগুলি হিমালয়ের ভালুক বা অন্য প্রাণীর। তবুও নৃতত্ত্ববিদরা এই কিংবদন্তিগুলি অধ্যয়ন করেন, কারণ এই ধরনের লোককথা সভ্যতা, ঐতিহ্য এবং মানুষের কল্পনাশক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু বলে।

প্রস্তর যুগ

যে কালের হাতিয়ারে প্রধানত পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যায়, সেই কালকে আমরা অশ্মযুগ বলি। 'অশ্ম' মানে পাথর।

ভেবে দেখো।

অশ্মযুগের মানব পাথর কোন কোন কাজে ব্যবহার করত ?

মানুষ পাথরের টুকরো ঘর্ষণ করে তীক্ষ্ণ হাতিয়ার তৈরি করত। শক্ত খোলযুক্ত ফল বা ভেতরের মজ্জার জন্য হাড় ভাঙতে সে এই ছেদন-হাতিয়ার ব্যবহার করত। পাথরকে আকার দেওয়াটাই ছিল তার বুদ্ধির বিকাশের প্রথম ধাপ। হাতিয়ারের আকারও ধরন অনুযায়ী অশ্মযুগকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় - পুরাপ্রস্তর যুগ, মধ্যপ্রস্তর যুগ এবং নবপ্রস্তর যুগ।

পুরাপ্রস্তর যুগ

পুরাপ্রস্তর যুগের মানব সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সে গুহায় বা বড় গাছের ডালে থেকে নিজেকে রক্ষা করত। পুরাপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকের হাতিয়ারগুলি ছিল এবড়োখেবড়ো। শিকার করা, আঁচড়ানো, খোঁড়া ইত্যাদি কাজে সে সেগুলি ব্যবহার করত। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল আগুনের আবিষ্কার, যা এই কালেই হয়েছিল।

ভেবে দেখো।

আগুনের ব্যবহার শিখতে পারায় মানবের জীবনে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল ? ভেবে লেখো।

- খাদ্য রান্না করতে লাগল, তাই তা হজম করা সহজ হল।
- ---------------------------
- ---------------------------
- ---------------------------

পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার নদী বা নালার পাড়ে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের পুরাপ্রস্তর যুগের স্থানগুলির মধ্যে নাসিকের কাছে গঙ্গাপুর এবং নেওয়াসার কাছে চিরকি-নেওয়াসা বিখ্যাত।

২.৩ মধ্যযুগ থেকে নবাশ্ম/নবপ্রস্তর যুগ

মধ্যপ্রস্তর যুগ

এই কালে বুদ্ধিমান মানব পাহাড়ের কোলে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক গুহায় এবং শৈলাশ্রয়ে আশ্রয় নিল। শৈলাশ্রয় (শিলা-আশ্রয়) মানে পাহাড়ের সামনে এগিয়ে আসা খাঁজ বা কোল। সেখানে সে দলবদ্ধভাবে থাকতে শুরু করল। এই কালে পাথরের হাতিয়ার তৈরির কৌশলে যথেষ্ট অগ্রগতি হল। হাতিয়ারের আকার ছোট হল। এখন সে বিভিন্ন ধরনের পাথর ব্যবহার করতে লাগল। শিকার, মাছ ধরা, ফসল কাটা, কাটাকাটি এই সব ধরনের কাজে এই হাতিয়ারগুলি উপকারী। সে শিং ও হাড় ঘষে ধারালো হাতিয়ার তৈরি করতে লাগল। মানব কুকুর, ছাগল, ভেড়া এই প্রাণীগুলিকে পোষ মানানো শুরু করল। কুকুরই হল প্রথম পোষ মানানো প্রাণী! মাছ ধরার শুরুও এই কালেই হয়েছিল। ক্রমে সে গুহায় বা অস্থায়ী শিবির করে থাকতে লাগল। এই কাল হল যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী জীবনের দিকে যাওয়ার সন্ধিকাল। মহারাষ্ট্রে জলগাঁও জেলার পাটনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রস্তর যুগের স্থান।

বলো তো দেখি !

দেওয়া ছবিটি লক্ষ্য করো। তার উপর শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

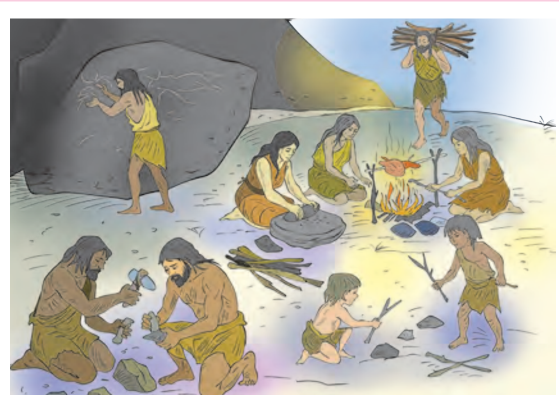

প্রাকৃতিক গুহা

■ নবপ্রস্তর যুগ

নবপ্রস্তর যুগে হাতিয়ার তৈরির কৌশলে আরও অগ্রগতি হল। এতে কুঠার নামে একটি নতুন পাথরের হাতিয়ার যোগ হল। পুরাপ্রস্তর যুগে কুঠারের ফলার আকারের হাতিয়ার ছিল, কিন্তু এখন মানব তাতে বাট লাগানোর কৌশল আবিষ্কার করল। আধুনিক কুঠারের এটাই প্রাথমিক রূপ বলতে হবে।

নবপ্রস্তর কুঠার

এই কালের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল কৃষি প্রযুক্তিতে অগ্রগতি। মধ্যপ্রস্তর যুগে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন ধানের ফসল কাটতে মানব শিখেছিল। নবপ্রস্তর যুগে উপযুক্ত ঋতুতে ধান বপন করা সে শুরু করল। এই কালে বীজ বোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত তাকে একটি জায়গায় থাকতে হত। এর ফলেই ধীরে ধীরে গ্রাম-বসতির উদয় হল।

করে দেখো।

পুরাপ্রস্তর যুগ, মধ্যপ্রস্তর যুগ ও নবপ্রস্তর যুগে মানবের জীবনধারায় যে পরিবর্তন হয়েছিল তা দেখানো একটি তুলনামূলক তালিকা তৈরি করো।

কৃষির আবিষ্কার নবপ্রস্তর যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই কালে খাদ্যশস্য ও দুধ উৎপাদন করার কলা মানব আয়ত্ত করেছিল। কৃষির সূচনার কৃতিত্ব মহিলাদের দেওয়া হয়। সূচালো লাঠির সাহায্যে মহিলারাই বীজ বোনার কাজ করত বলে মনে করা হয়। বীজ বোনার জন্য ব্যবহৃত সূচালো লাঠিকে পর্যাপ্ত ভার দেওয়া ও মাটিতে গভীরভাবে খোঁড়ার জন্য সেই লাঠিগুলির মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত পাথর লাগানো হত। কিছু আদিবাসী জনজাতির মহিলারা এখনও এই পদ্ধতিতে বীজ বোনে। প্রয়োজন মতো

সূচালো লাঠির সাহায্যে মহিলারাই বীজ বোনার কাজ করত

খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে লাগায় মানবের নিত্যকার ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হল। কৃষির ফলে পাওয়া স্থিরতার কারণে পাকা খাদ্যশস্য দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হল। দলের সকলের প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত থাকার মতো ধান পাওয়া যেতে লাগল। ফলে, দলের কিছু নারী-পুরুষ নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে, সৃজনশীলতার ভিত্তিতে নতুন দক্ষতা গড়ে তুলতে যথেষ্ট সময় পেতে লাগল। জীবনে স্থায়িত্ব আসায় মানব অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি করতে পারল।

কৃষির পাশাপাশি মানব প্রাণীদের পোষ মানাতে শিখল। কিছু প্রাণীকে কঠোর পরিশ্রমের কাজে এবং ভার বহনে ব্যবহার করা হল।

কৃষি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাটির পাত্র তৈরির কলার উদ্ভব হল। নানা আকার ও রঙের পাত্র তৈরি করে তার উপর সুন্দর কারুকাজ করতে মানব শুরু করল। কাপড় বোনার কলাও এই সময়েই মানব প্রাপ্ত করল। কাঠের নৌকা বানিয়ে জলে চলাফেরার কৌশল সে নবপ্রস্তর যুগে শিখল।

নবপ্রস্তর যুগে কৃষির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব নদীর তীরে উর্বর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। তাদের ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হল। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান এই কালে আকার নিতে শুরু করল।

২.৪ তাম্রপ্রস্তর যুগ

মানব তামা ধাতু আবিষ্কার করল। তামার ব্যবহার শুরু হল। তবে এই কালে পাথরের হাতিয়ারও ব্যবহার করা হত। তাই এই পর্বকে 'তাম্রপ্রস্তর যুগ' বলা হয়। তাম্রপ্রস্তর যুগে চাকার আবিষ্কার হল। চাকার ফলে যাতায়াত দ্রুত ও সহজ হল। এই কালে বিপুল পরিমাণ জমি চাষের আওতায় আনা হল।

জিনিসপত্র আনা-নেওয়াও শুরু হল। বাণিজ্য বাড়ল। তাম্রপ্রস্তর যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ল,তার সঙ্গে দক্ষতা-নির্ভর কাঠের কাজ, ধাতুশিল্পের মতো পেশা শুরু হল। এর ফলে বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠল এবং সেগুলির বিস্তার হয়ে নগর তৈরি হল।

তাম্রপ্রস্তর যুগের মানব গম, জোয়ার, ধান, ডাল, তুলার উৎপাদন করত। সে শিকার ও মাছ ধরাও কিছুটা করত, কিন্তু এই কাজগুলি তার জীবিকার প্রধান উপায় ছিল না। কৃষির পরিপূরক হিসেবে গরু, বলদ, মুরগি পালনও তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল।

এই কালে মৃত ব্যক্তিকে ঘরের ভেতরে বা ঘরের উঠানেই সমাধিস্থ করা হত। সমাধির সময় কখনো কখনো মৃত ব্যক্তির পাশে তার নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ও পাত্র রাখা হত বলে দেখতে পাওয়া যায়।

২.৫ মহারাষ্ট্রের উৎখনন স্থানসমূহ

মহারাষ্ট্রে তাম্রপ্রস্তর সভ্যতার স্থানগুলি তাপ্তি, গোদাবরী, কৃষ্ণা, ভীমা, প্রবরা প্রভৃতি নদীর তীরে পাওয়া গেছে। এখানে পাথরের হাতিয়ার, মাটির পাত্র, তামার জিনিসপত্র, ধান সংরক্ষণের জন্য হাতে তৈরি মাটির কলস এই সব প্রমাণ উৎখননে পাওয়া গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ উৎখনন স্থান	উৎখননে প্রাপ্ত প্রধান প্রমাণসমূহ
দায়মাবাদ (জেলা আহিল্যানগর) দায়মাবাদ মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং গবেষণার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই স্থানটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বি.পি.বোপার্ডিকার আবিষ্কার করেছিলেন।	কাঁসা ধাতুর চারটি বস্তু পাওয়া গেছে। গাড়িতে জোতা বলদ,মহিষ,গণ্ডার ও হাতি এই চারটি বস্তু। এখন 'দায়মাবাদ ব্রোঞ্জেস' নামে পরিচিত।
ইনামগাঁও(জেলা পুণে) ইনামগাঁও উন্নত তাম্রপ্রস্তর গ্রাম-বসতির একটি চমৎকার উদাহরণ। এই স্থানের উৎখনন পুরাতত্ত্ববিদ ড.হ.ধী.সাংকালিয়া, ড.জেড.ডি. আনসারি এবং ড.ম.কে.ঢবলিকার করেছিলেন।	গম, যব, ধান, ডাল, বাজরা ও তিল চাষের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়। গরু,ভেড়া ও ছাগলের মতো গৃহপালিত পশুর হাড় পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বন্য পশু শিকারের (যেমন - হরিণ, নীলগাই, শূকর)ও মাছ ধরার প্রমাণও পাওয়া গেছে। চাকায় তৈরি লাল ও কালো রঙের, এবং জ্যামিতিক আকৃতির নকশা করা মাটির পাত্র। বিশেষ বিষয় - দুটি মাটির পাত্রের মুখ একে অপরের সঙ্গে জুড়ে তার মধ্যে ছোট শিশুদের সমাধিস্থ করা পাওয়া গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ উৎখনন স্থান	উৎখননে প্রাপ্ত প্রধান প্রমাণসমূহ
জোর্বে (জেলা - আহিল্যানগর) জোর্বে সভ্যতা মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত তাম্রপ্রস্তর সভ্যতা বলে মনে করা হয়। এই সভ্যতার প্রথম প্রমাণ জোর্বেতেই পাওয়া গিয়েছিল। এই স্থানের উৎখনন পুরাতত্ত্ববিদ ড.হ.ধী. সাংকালিয়া এবং ড.শাং.ভা.দেব-এর তত্ত্বাবধানে করা হয়েছিল।	লাল ও কালো রঙের মাটির পাত্র, তামার বালা মণি। গোল বা চতুষ্কোণ আকারের ঘরের বিন্যাস এবং ধান সংরক্ষণের জন্য মাটির ভাণ্ডার। জোয়ার চাষের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
সাবলদা (জেলা - নন্দুরবার) সাবলদা সংস্কৃতি মহারাষ্ট্রের কৃষি ভিত্তিক প্রাচীনতম সংস্কৃতিগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রত্ন তাত্ত্বিক ড. এইচ. ভি. সাঙ্কলিয়া সাবলদার খনন করেছিলেন।	লাল ও কালো রঙের, চাকে তৈরি এবং জ্যামিতিক আকৃতির নকশা করা মাটির পাত্র।
নেওয়াসা (জেলা - আহিল্যানগর) নেওয়াসা মহারাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎখনন স্থান। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রাক্তন মহানির্দেশক ড. এম. এন. দেশপাণ্ডে এই স্থানটি আবিষ্কার করেছিলেন।	রঙিন মাটির পাত্র, পাথরের কুঠার, তামার গহনার অবশেষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, বলদের অবশেষ পাওয়া গেছে।

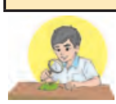

খুঁজে দেখো।

মহারাষ্ট্রে উপরের দেওয়া উৎখনন স্থানগুলি কোন কোন নদীর তীরে আছে?

অনুশীলনী

প্র.১ ক) নাম লেখো।

১. ভারতের কালো মৃত্তিকায় মালভূমি -----------

২. ভারতের কৃষির জন্য সবচেয়ে অনুকূল প্রদেশ -----------

৩. লিপির উৎপত্তি বা বিকাশ হয়নি যে কালে -----------

৪. ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে বিভাগ, দারা দয়ামাবাদের খনন স্থলটি আবিষ্কার করেছিলেন। -----------

খ) সঠিক জোড় মেলাও

‘ক’ দল	‘খ’ দল
১. পুরাপ্রস্তর যুগ	ক) বড় ধারালো হাতিয়ার
২. মধ্যপ্রস্তর যুগ	খ) চাকার আবিষ্কার
৩. নবপ্রস্তর যুগ	গ) কৃষি প্রযুক্তিতে অগ্রগতি
৪. তাম্রপ্রস্তর যুগ	ঘ) অগ্নির আবিষ্কার

প্র. ২ ক) নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

ক্র.	বৈশিষ্ট্য	মধ্যপ্রস্তর যুগ	নবপ্রস্তর যুগ
১.	বাসস্থান	গুহা	-----------
২.	বানিজ্য	-----------	কৃষি, পশুপালন
৩.	সরঞ্জাম	ক্ষুদ্র পাথরের সরঞ্জাম	-----------
৪.	শিল্পকলা	-----------	রঙিন মাটির পাত্র
৫.	জীবনধারা	যাযাবর	-----------

খ) নীচের বাক্যগুলি ভুল না ঠিক তা সংশোধন করে লেখো।

১. জোরওয়েতে চারটি ব্রেঞ্জের বস্তু পাওয়া গেছে।

----

২. জোরওয়েতে সংস্কৃতির প্রথম নিদর্শণ মেভাসায় পাওয়া গিয়েছিল।

----

৩. ইনাম গাঁও হলো মহারাষ্ট্রের আদি কৃষকদের একটি প্রাচীন তাম্রযুগীয় সংস্কৃতি।

প্র.৩ ক) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

১. নবপ্রস্তর যুগে মানবের জীবনধারা কীভাবে বদলেছিল ?

২. তাম্রপ্রস্তর যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?

খ) নীচের যুগগুলির প্রতিটির দুটি করে বৈশিষ্ট্য লেখো।

১. পুরাপ্রস্তর যুগ

২. তাম্রপ্রস্তর যুগ

প্র.৪ ক)নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো।

১. নবপ্রস্তর যুগের মানব যদি কৃষি প্রযুক্তি আবিষ্কার না করত, তাহলে আজকের মানবজীবন কেমন হত ? কারণসহ উত্তর দাও।

২. নবপ্রস্তর যুগে মাটির পাত্র তৈরির কলা বিকশিত হওয়ায় মানবের দৈনন্দিন জীবন কীভাবে বদলে গেল ?

প্র.৫ তোমরা একটি নতুন বাড়ি নিতে চাও। এর জন্য কোন কোন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ভেবে তুমি নতুন বাড়ি নেবে।

উদাহরণ: জল

কার্যাবলি –

- দক্ষ কুম্ভকার চাকার সাহায্যে মাটির পাত্র তৈরি করার সময় কোন কোন কাজ করেন, তা জানতে তাকে স্কুলে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার সাক্ষাৎকার নাও। কিছু জিনিস নিজেরাও তৈরি করে দেখো।
- ভারতের নীচের সভ্যতাগুলির স্থান চিহ্নিত করো।

  ১. ভারতের পর্বতমালা

  ২. ভারতের নদীসমূহ

  ৩. ভারতের সমুদ্র তট

উপক্রম

১. মহারাষ্ট্রের উৎখনন স্থানগুলি মহারাষ্ট্রের মানচিত্রে চিহ্নিত করো।

২. যদি আমি আদিমানব হতাম তাহলে কোথায় থাকতাম ? কী খেতাম ? এর উপর ভিত্তি করে একটি নাটক বা ভূমিকা অভিনয় (রোল প্লে) উপস্থাপন করো।

***

৩ হরপ্পা সভ্যতা

৩.১ কালপর্ব

৩.২ স্থান ও বিস্তার

৩.৩ জনজীবন

৩.৪ হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ৪৫০০ বছর আগে একটি নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমরা তাকে হরপ্পা সভ্যতা বলি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সভ্যতা এতটাই উন্নত ছিল যে সেই সভ্যতার নগরগুলিতে পরিষ্কার ও প্রশস্ত রাস্তা, সুপরিকল্পিত নগর-বিন্যাস, সমৃদ্ধ বাণিজ্য এবং লিখনপদ্ধতির ব্যবহার ছিল। হাজার হাজার বছর আগেও আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উন্নত ছিল, এটা হরপ্পা সভ্যতার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

বলো তো দেখি!

নগর সভ্যতা সম্পর্কে তোমাদের যা জানা আছে, তা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

- **হরপ্পা যুগে নগরগুলি কীভাবে পরিকল্পিত হতো ?**
- **মানুষের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল ?**
- **বাণিজ্য-ব্যবস্থা ও কৃষির পদ্ধতি কেমন ধরনের ছিল ?এই শহরগুলির পতন কেন ও কীভাবে হলো ?**

চলো, এই সব প্রশ্নের উত্তর বুঝতে ইতিহাসের জানালা দিয়ে সরাসরি হরপ্পা সভ্যতার যুগে উঁকি দিয়ে দেখি।

সভ্যতা হলো প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবনপদ্ধতি এই বাক্য থেকে তোমরা কী বুঝলে, তা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

সভ্যতা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। আমরা আগের পাঠে জেনেছি যে নদীতীরের সভ্যতাগুলি কীভাবে গড়ে উঠেছিল। সেগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হতে হতে নগর সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়। তারই মধ্যে একটি প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতা হলো হরপ্পা সভ্যতা। এই সভ্যতার অনেক স্থান সিন্ধু নদীর অববাহিকায় পাওয়া গেছে। তাই একে সিন্ধু সভ্যতাও বলা হয়। প্রত্নতত্ত্বে কোনো সভ্যতার প্রমাণ উপস্থাপনকারী প্রথম খননকার্য যে শহরে হয়, সেই শহরের নাম ওই সভ্যতাকে দেওয়া হয়। পঞ্জাবের রাভি নদীর তীরে হরপ্পায় ১৯২১ সালে প্রথম খননকার্য শুরু হয়েছিল, তাই এই সভ্যতার নাম হয়েছে হরপ্পা সভ্যতা।

নদীতীরের সভ্যতাগুলি

কল্পনা করো, আমরা হাজার হাজার বছর আগেকার যুগে প্রবেশ করছি। হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস কেবল একটি কালপর্বের নয়, **এটি মানব সভ্যতার ইতিহাসের একটি যাত্রা।** এই কালপর্বে নানা ঘটনা ঘটেছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে এবং এই সভ্যতা ধাপে ধাপে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পরে নানা বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হওয়ায় এই সভ্যতার পতন ঘটতে থাকে। অর্থাৎ এই সভ্যতার কালপর্বে নানা ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ, উৎকর্ষ এবং অবশেষে পতন হয়েছিল।

৩.১ কালপর্ব

কল্পনা করো, আমরা হাজার হাজার বছর আগেকার যুগে প্রবেশ করছি। হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস কেবল একটি কালপর্বের নয়, এটি মানব সভ্যতার ইতিহাসের একটি যাত্রা। এই কালপর্বে নানা ঘটনা ঘটেছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে এবং এই সভ্যতা ধাপে ধাপে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পরে নানা বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হওয়ায় এই সভ্যতার পতন ঘটতে থাকে। অর্থাৎ এই সভ্যতার কালপর্বে নানা ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ, উৎকর্ষ এবং অবশেষে পতন হয়েছিল।

আমরা হরপ্পা সভ্যতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় খুঁজে দেখি!

হরপ্পা সভ্যতার কাল সাধারণত নীচের মতো ভাগ করা হয়:

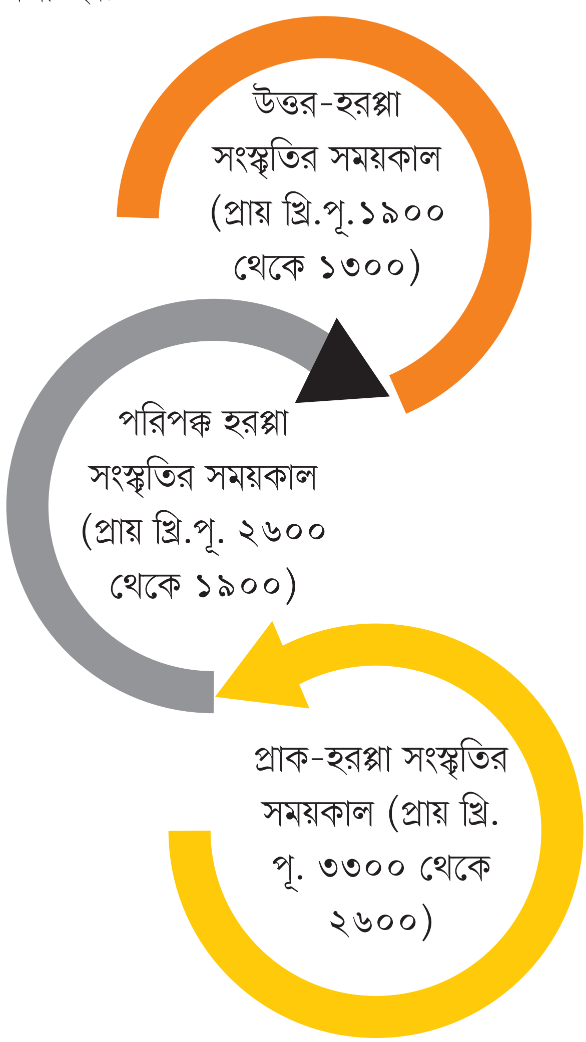

হরপ্পা সভ্যতার গ্রাম-বসতি - প্রারম্ভিক কাল এই সময়কাল পূর্ব হরপ্পা সভ্যতার কাল (খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩৩০০ থেকে ২৬০০) নামে পরিচিত। এই কালে ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে শহরের দিকে বিকাশ ঘটেছিল এবং নগরায়ণ-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

পরিণত হরপ্পা সভ্যতার সমৃদ্ধ কাল - পরিণত হরপ্পা সভ্যতার সমৃদ্ধ কাল (খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২৬০০ থেকে ১৯০০), এই কাল সিন্ধু সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত হয়। নগর পরিকল্পনা, প্রশাসন, বাণিজ্য, হস্তশিল্প, ভাস্কর্যশিল্পের বিকাশ ঘটে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, ধোলাভীরা, লোথাল-এর মতো সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলি এই সময়ে গড়ে উঠেছিল।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের কাল - উত্তর হরপ্পা সভ্যতার কাল (খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৯০০ থেকে ১৩০০), এই কালে ধীরে ধীরে হরপ্পা সভ্যতার পতন শুরু হয়। সেখানকার প্রধান কেন্দ্রগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিছু জায়গায় সভ্যতার অবশেষ পাওয়া গেছে। তা থেকে সভ্যতার পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

খুঁজে দেখো।

'হরপ্পা সভ্যতা' শীর্ষক মানচিত্রে প্রাচীন ভারতে হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার কোথায় হয়েছিল তা দেখাও। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবাঙান, ধোলাভীরা, রাখিগড়ি এই শহরগুলি কোন অঞ্চলে আছে? এই স্থানগুলি বর্তমানে কোন অঞ্চলে আছে তা লিখে রাখো।

৩.২ স্থান ও বিস্তার

হরপ্পা সভ্যতার মূল বসতি ছিল সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির তীরে। এই নদীগুলির তীরবর্তী উর্বর জমির কারণে কৃষিকাজ চলন হয়েছিল। নদীর তীরে গ্রাম-বসতি গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবাঙান, লোথাল, ধোলাভীরা,

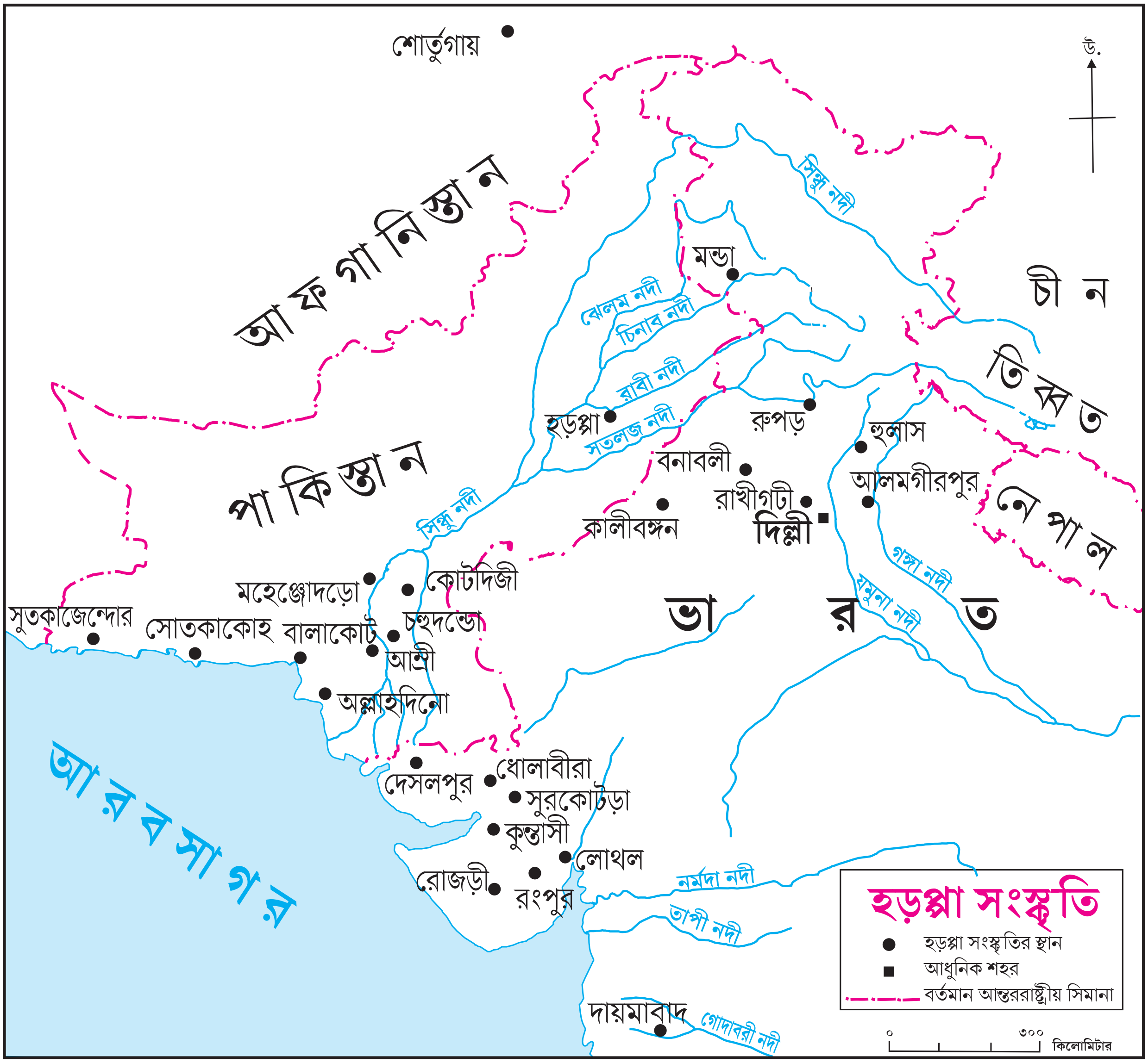

রাখিগড়ি, বনওয়ালি এবং চাহুনদারো প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এই সভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার উত্তরে জম্মু-কাশ্মীরের মান্ডা থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাতের ধোলাভীরা ও লোথাল এবং মহারাষ্ট্রের আহিল্যানগরের কাছে দাইমাবাদ পর্যন্ত ছিল। পশ্চিমে বালুচিস্তান (আজকের পাকিস্তান) পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতা পৌঁছেছিল, আর পূর্বে উত্তর প্রদেশের আলমগীরপুর পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার ছিল। দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যই ছিল হরপ্পা সভ্যতার বিস্তারের প্রধান কারণ।

৩.৩ জনজীবন

হরপ্পা সভ্যতার স্থানগুলিতে খননকার্যে প্রাপ্ত প্রমাণ থেকে সেখানকার জনজীবনের তথ্য পাওয়া যায়। যে ভৌতিক প্রমাণগুলি পাওয়া গেছে, তা থেকে দেখা যায় যে তাদের জীবনপদ্ধতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। নগর-বিন্যাস, সুশৃঙ্খল রাস্তা, গৃহনির্মাণ, পয়ঃপ্রণালীর উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, লিখনযুক্ত সীলমোহর, উৎকৃষ্ট মানের মাটির পাত্র, নানা ধরনের খেলনা এগুলি হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

বাসস্থান ও গৃহ-বিন্যাস

হরপ্পা সভ্যতার মানুষের ঘরবাড়ি পোড়া ইট দিয়ে তৈরি হতো।

তোমরা জানো কী ?

হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা তাদের ঘরবাড়ি নির্মাণে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, তাকে ইংলিশ বন্ড পদ্ধতিও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে আড়াআড়ি ও খাড়া ইট এমন বিশেষভাবে সাজানো হতো, যাতে দেয়ালগুলি আরও শক্ত ও টেকসই হয়। ইটগুলি সুনির্দিষ্ট আকারের ছিল। একটি ইট সাধারণত ১:২:৪ অনুপাতে হতো। হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল কারণ তারা চাইত তাদের বাড়িগুলি বন্যা, ভূমিকম্প এবং কালক্রমে ক্ষয় থেকে রক্ষা পাক।

ঘরে মাঝখানে উঠান, তার চারপাশে ঘর, প্রবেশদ্বারের কাছে কুয়ো এবং শৌচাগার থাকত। জলসরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। প্রতিটি বাড়ি থেকে নোংরা জল বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পোড়ামাটির নলের ব্যবহার করা হতো। একটি বিশেষ বিষয় হলো রাস্তার নর্দমাগুলি ইট দিয়ে তৈরি ছিল এবং সেগুলি সুষ্ঠুভাবে ঢাকা থাকত। এ থেকে বোঝা যায়, তারা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিল।

তোমার মত কী ?

হরপ্পা সভ্যতা থেকে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' পর্যন্ত চিন্তা করলে স্পষ্ট হয় যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটি মৌলিক প্রয়োজন।

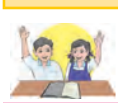

বলো তো দেখি !

তোমার গ্রামে বা শহরে পরিচ্ছন্নতা কীভাবে রক্ষা করা হয়, তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

হরপ্পা যুগের শহরের রাস্তার জালিকা সমান্তরাল এবং পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে এমনভাবে পরিকল্পিত ছিল। এতে তৈরি হওয়া চতুষ্কোণ খোলা জায়গায় বাড়ি তৈরি করা হতো।

নগরগুলিতে দুটি বা তার বেশি বিভাগ থাকত। তার মধ্যে দুর্গ (কোট) নামে পরিচিত বিভাগে নগরের শাসকরা বাস করতেন বলে মনে করা হয়। এই দুর্গ কেল্লার মধ্যেকার গড়ের (বালেকিল্লা) মতো উঁচু জায়গায় তৈরি হতো।তার চারপাশের নগরে সাধারণ মানুষ বাস করতেন বলে মনে করা হয়। প্রতিটি বিভাগে আলাদা প্রাচীর থাকত।

করে দেখো।

বালেকিল্লা (গড়) বলতে বোঝায় কোনো কেল্লার সবচেয়ে ভেতরের ও নিরাপদ অংশ, যাকে কেল্লার হৃদয় বলা হয়। এটি সাধারণত কেল্লার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় তৈরি হতো, ফলে আশেপাশের এলাকায় নজর রাখা সহজ হতো এবং শত্রুর আক্রমণের সময় এটি শেষ রক্ষাস্থল হিসেবে কাজ করত। বালেকিল্লায় রাজপ্রাসাদ, দরবার, অস্ত্রাগার, শস্যভাণ্ডার এবং মন্দিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকত। রায়গড়, রাজগড়-এর মতো কেল্লায় বালেকিল্লা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এর যেকোনো একটি বালেকিল্লার ছবি বোর্ডে বা তোমার খাতায় এঁকে দেখো।

মহেঞ্জোদারোর মহাস্নানাগার এই যুগের স্থাপত্যের একটি বিশেষ নিদর্শন। মহাস্নানাগার ও তার আশপাশের এলাকায় কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হতো বলে কিছু পণ্ডিতের মত রয়েছে।

মহেঞ্জোদারোর মহাস্নানাগার

মহাস্নানাগারে একটি বড় জলাশয় আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ মিটার, প্রস্থ ৭ মিটার এবং গভীরতা ২.৫ মিটার। এটি পোড়া ইট দিয়ে তৈরি এবং জল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত নলের ব্যবস্থা ছিল। এতে জল ভরার ও জল বের করার জন্য বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পাশেই ছোট ছোট ঘর ছিল।

খাদ্যাভ্যাস

গম, যব (বার্লি), মটর, তিল, রাগি, মসুর এবং নানা ধরনের ডাল ছিল মানুষের খাদ্যের মুখ্য উপাদান। দুধ, মাংস, মাছও কোনো কোনো জায়গায় খাওয়া হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খাবার রান্না করার জন্য তারা মাটির পাত্র ব্যবহার করত। কিছু পাত্রে সুন্দর রঙের কাজ ও নকশাও থাকত। এই নকশা লাল রঙের পাত্রে কালো রঙে আঁকা হতো। নকশার নমুনায় মাছের আঁশ, পরস্পরে জড়ানো বৃত্ত, অশ্বত্থ পাতা প্রভৃতি প্রতীকের অন্তর্ভুক্তি ছিল।

পাত্র

আলোচনা করো।

গম, ছোলা, ধান, যব, মসুর, কলাই, বাজরা প্রভৃতির মধ্যে কোন ধান্য হরপ্পা যুগে ছিল এবং কোনটি ছিল না এবং না থাকলে কেন ছিল না, তা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

পোশাক ও গহনা

হরপ্পা সভ্যতার মানুষের পোশাক ও গহনা সেই যুগের প্রযুক্তি, সৌন্দর্যবোধ ও জীবনধারার তথ্য দেয়। হরপ্পা যুগের মানুষেরা তুলো এবং রেশম সুতো থেকে বস্ত্র তৈরি করেছিল।

হরপ্পা সভ্যতার গহনা

পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া সীলমোহর ও ভাস্কর্যের মতো প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের পোশাক সম্পর্কে অনুমান করা যায়। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের পোশাকে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্র ও উত্তরীয়র অন্তর্ভুক্তি ছিল। হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা গহনা তৈরিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তারা মাটি ও নুড়িপাথরের রঙিন পাথর, শঙ্খ, তামা, রুপো এবং সোনার মণি বানাত। এগুলির অন্যান্য দেশে, বিশেষত মেসোপটেমিয়ায়, প্রচুর চাহিদা ছিল। হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা হার, কানের গহনা, বাজুবন্ধ, চুড়ি, আংটি, কোমরবন্ধ প্রভৃতি অলংকার ব্যবহার করত।

পেশা ও বাণিজ্য

হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা কৃষিকাজ করে নানা ফসল ফলাত। তার মধ্যে গম ও যব (বার্লি) ছিল মুখ্য ফসল। হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা তুলো সম্পর্কে জানত। হরপ্পা সভ্যতার কারিগরেরা লোহা, ব্রোঞ্জ, মাটি, সোনা থেকে বস্তু তৈরি করা, কাপড় বোনা প্রভৃতি পেশায় যুক্ত থাকত। উৎকৃষ্ট মানের মাটির পাত্র তৈরি করত। নৌচালনা তারা জানত, ফলে দূরদূরান্তে বাণিজ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো।

তোমরা জানো কী ?

কালিবংগন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কর্ষিত কৃষিজমি পাওয়া গেছে। এটি আজকের রাজস্থান রাজ্যের হনুমানগড় জেলায়, ঘগ্গর নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

এ থেকে বোঝা যায় যে কালিবংগনের মানুষেরা কৃষিতে উন্নত ছিল। তারা গম, যব, ছোলার মতো নানা শস্য চাষ করেছিল। আজও কালিবংগন এলাকায় কৃষিকাজে উটের ব্যবহার করা হয় এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সেখানকার হালচাষের চিহ্ন ও হরপ্পাযুগীয় চিহ্নের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

কালিবংগনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে অগ্নিকুণ্ড পাওয়া গেছে, যেগুলি ধর্মীয় আচার-

অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতো বলে মনে করা হয়। হরপ্পা সভ্যতার অন্যান্য শহরের মতো এখানেও পরিকল্পিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইটের বাড়ি এবং সীলমোহরের নমুনা পাওয়া গেছে।

হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা কেবল নিজেদের গ্রামে বা পাশের শহরের সাথে নয়, দূরবর্তী দেশগুলির সাথেও বাণিজ্য স্থাপন করেছিল। তারা আজকের ইরাক (মেসোপটেমিয়া), ইরান, মিশরের সাথে পণ্যের আদান-প্রদান করত। তারা মণি, গহনা, মাটির পাত্র এবং তুলো বিক্রি করত। তার বিনিময়ে ধাতু, মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য বস্তু আনত। এতে ফায়েন্স ও কার্নেলিয়ান দীর্ঘ মণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফায়েন্স হলো কাচের মতো একটি পদার্থ, যা মূলত নীল, সবুজ ও ফিরোজা রঙে তৈরি হতো। হরপ্পায় তৈরি ফায়েন্সের চুড়ি, মণি ও গহনা বাণিজ্যপথ দিয়ে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমেরে প্রচুর পরিমাণে পৌঁছাত। এ ছাড়া রক্তাভ আগেট (কার্নেলিয়ান) ছিল লালচে রঙের একটি রত্নপাথর, যা থেকে লম্বা ও গোলাকার মণি তৈরি হতো। এই মণি মেসোপটেমিয়ায় বিক্রি হতো। সেখানে সেগুলি গহনায় ও ধর্মীয় বস্তুতে ব্যবহার হতো। এই বাণিজ্য থেকে হরপ্পা সভ্যতা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

তোমরা জানো কী ?

ইনান্না দেবী ছিলেন সুমের সভ্যতার একটি প্রধান দেবী। মেসোপটেমিয়ার মহাকাব্যে বর্ণিত পৌরাণিক কাহিনি থেকে হরপ্পাযুগীয় বাণিজ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ইনান্না দেবী তার ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসেবে লাজওয়ার্দ ব্যবহার করতেন। লাজওয়ার্দ হলো নীল রঙের একটি মূল্যবান পাথর। প্রাচীনকালে লাজওয়ার্দ অত্যন্ত দুর্লভ ও মূল্যবান বলে বিবেচিত

হতো। এর খনি ছিল আফগানিস্তানে। হরপ্পাযুগীয় বণিকেরা এর বাণিজ্য করত। মেসোপটেমিয়ায় এর

চাহিদা বেশি ছিল। ইনান্নার কাহিনিতে লাজওয়ার্দ প্রসঙ্গ প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু। পৌরাণিক কাহিনিকে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে করা হয়, কারণ সেগুলিতে সেই যুগের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা যায়। এই কাহিনিগুলিতে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তি বা স্থানের উল্লেখ থাকে, তাই সেগুলি ইতিহাসের অধ্যয়নে উপযোগী।

সেই যুগের লোথাল শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, এখানে বিশাল আকারের গোদি (ডক) পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্য আরব সাগরের তীর বেয়ে ইরানের উপসাগর পর্যন্ত চলত। হরপ্পার মানুষেরা সীলমোহর প্রধানত বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করত বলে মনে করা হয়। সীলমোহরে ষাঁড়, হাতি, মোষ, গণ্ডার, বাঘের মতো পশু-পাখির ছবি এবং কখনো কখনো মানবাকৃতিও দেখতে পাওয়া যায়।

বলো তো দেখি !

ছবিতে হরপ্পাযুগীয় সীলমোহর দেখো, তাতে এককর্ণ (একশিংওয়ালা কাল্পনিক প্রাণী) নামক কল্পিত প্রাণীর ছবি দেখা যাচ্ছে। তোমরা কোন কোন বস্তুতে বা স্থাপত্যে এমন কাল্পনিক প্রাণী দেখেছ?

শিল্পকলা ও বিনোদন

হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা শিল্পপ্রেমী ও দক্ষ কারিগর ছিলেন। তারা মাটি, ধাতু ও মূল্যবান পাথর ব্যবহার করে অনেক সুন্দর বস্তু তৈরি করেছিলেন।

হরপ্পা সভ্যতায় একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া গেছে, যাকে 'নর্তকী' বলা হয়। এ ছাড়া হরপ্পার মানুষেরা পশু-পাখির মূর্তি, খেলনা ও সীলমোহর তৈরি করেছিলেন। হরপ্পা সভ্যতার একটি অত্যন্ত বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো সেখানে পাওয়া একটি বিশেষ মূর্তি। এই মূর্তিটি মহেঞ্জোদারোতে খননকার্যে পাওয়া গেছে। এটি বর্তমানে নতুন দিল্লির জাতীয় জাদুঘরে রাখা আছে। এই মূর্তিটি একটি শান্ত, রহস্যময় ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। তাকে 'রাজা-পুরোহিত' বলা হয়।

হরপ্পাযুগীয় মূর্তি

হরপ্পাযুগীয় মাটির খেলনা

পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া বস্তু থেকে দেখা যায় যে শিশুদের জন্য বিশেষভাবে খেলনা তৈরি করা হতো। এই খেলনাগুলি মাটি দিয়ে তৈরি হতো। তার মধ্যে ষাঁড়, কুকুর, হাতির মতো পশুর মূর্তি এবং চাকায় চলা গাড়ি, ভোঁমরা, শিস-এর অন্তর্ভুক্তি ছিল।

৩.৪ হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ

হরপ্পা সভ্যতা ছিল ভারতের একটি অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ সভ্যতা। কিন্তু কিছুকাল পরে এই সভ্যতার ধীরে ধীরে পতন শুরু হয়। এই পতনের পেছনে কী কারণ ছিল তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সবচেয়ে প্রধান কারণ হলো নদীর প্রবাহে পরিবর্তন এসে থাকতে পারে। নদীর প্রবাহ বদলে যাওয়ায় জলের অভাব দেখা দিয়েছিল। এর ফলে কৃষি ও জীবনযাত্রার উপর প্রভাব পড়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো বন্যা, খরা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নগরগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ নাগাদ সুমেরীয় বাণিজ্য কমতে শুরু করে এবং হরপ্পা সভ্যতার পতনের সূচনা হয়।

তোমরা জানো কী ?

সার্গন ছিলেন আক্কাদ সাম্রাজ্যের একজন শক্তিশালী রাজা। তার আমলে মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বাণিজ্যে লাজওয়ার্দ, সোনা, রুপো, মণি প্রভৃতি মূল্যবান বস্তুর আদান-প্রদান হতো। কিন্তু সার্গনের পরে মেসোপটেমিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। তার প্রভাব হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যের উপর পড়ে। ফলে সার্গনের আমলের বাণিজ্য ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। পরিণামে হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলির অর্থনীতি পতনের দিকে যায়, শিল্পবাণিজ্য কমে যায় এবং মানুষ নগর ছেড়ে ছোট গ্রামের দিকে চলে যায়।

হরপ্পা সভ্যতার প্রভাব দীর্ঘকাল টিকে রয়েছিল। হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলি আজ লুপ্ত হয়ে গেলেও, তাদের অবশেষ থেকে আমরা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সেই যুগের জীবনধারার তথ্য পাই। এই সভ্যতা থেকে আমরা প্রকৃতির সাথে সহাবস্থান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলাবদ্ধতা ও সহজ জীবনযাপনের গুরুত্ব শিখতে পারি। তাই হরপ্পা কেবল একটি প্রাচীন সভ্যতা নয়, এটি আমাদের সভ্যতার একটি গর্বিত উত্তরাধিকার।

করে দেখো।

নীচের লাইনগুলিতে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলির নাম কী ছিল ? শহরগুলি কেমন ছিল ? কোন শিল্পকর্ম পাওয়া গেছে ? কোন পণ্যের বাণিজ্য হতো ? ইত্যাদির তথ্য লেখো।

অনুশীলনী

প্র.১ ক) দেওয়া বিকল্পগুলির থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নাও।

১. হরপ্পা সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে .... নদীর তীরে।

ক) গঙ্গা খ) যমুনা
গ) সিন্ধু ঘ) গোদাবরী

২. হরপ্পা সভ্যতার মহাস্নানাগার .... এই স্থানে পাওয়া গেছে।

ক) ধোলাভীরা খ) লোথাল
গ) কালিবংগন ঘ) মহেঞ্জোদারো

৩. হরপ্পা সভ্যতার .... এই শহরে গোদি (ডক) পাওয়া গেছে।

ক) লোথাল খ) রাখিগড়ি
গ) বনওয়ালি ঘ) ধোলাভীরা

খ) ঠিক না ভুল লেখো।

১. দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যই ছিল হরপ্পা সভ্যতার বিস্তারের প্রধান কারণ। ☐

২. হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ☐

৩. ব্যবসাবাণিজ্য কমে যাওয়া হরপ্পা সভ্যতার পতনের একটি কারণ ছিল। ☐

প্র.২ ক) ধারণাচিত্র সম্পূর্ণ করো।

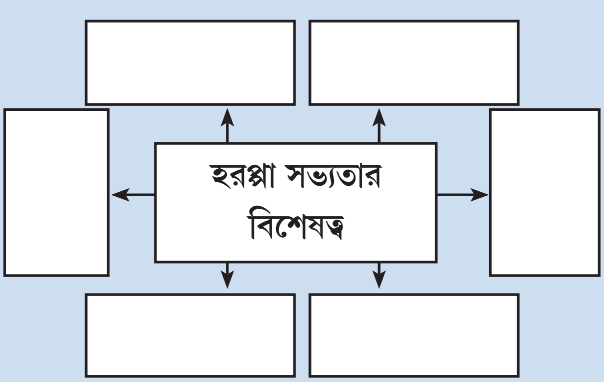

খ) শব্দ-ধাঁধা থেকে খননকার্যে প্রাপ্ত নগরগুলির নাম সম্পূর্ণ করো।

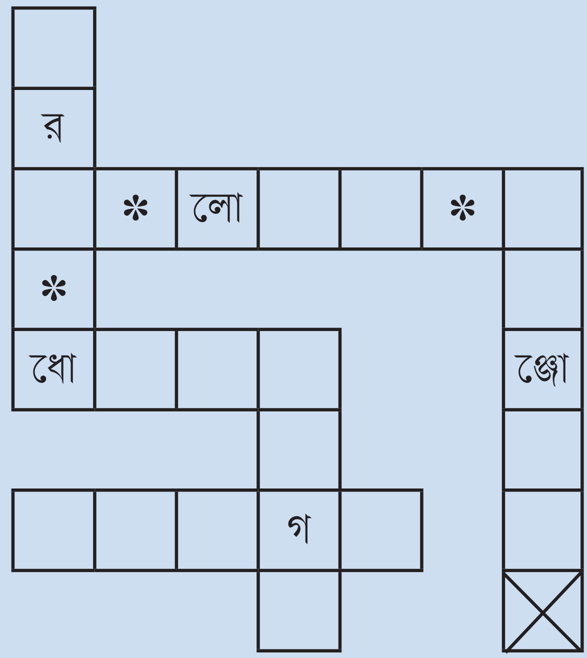

প্র.৩ টীকা লেখো।

১. মহাস্নানাগার
২. পোশাক ও গহনা
৩. শিল্পকলা ও বিনোদন

প্র. ৪ পাঠের মানচিত্রটি দেখো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

১. ভারতের রাজস্থান রাজ্যের হরপ্পা সভ্যতার যেকোনো একটি স্থানের নাম লেখো।

২. ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানার বাইরে হরপ্পা সভ্যতার যেকোনো একটি স্থানের নাম লেখো।

৩. মান্ডা হরপ্পা সভ্যতার স্থানটি কোন নদীর তীরে আছে ?

৪. দাইমাবাদ হরপ্পা সভ্যতার স্থানটি বর্তমান ভারতের কোন রাজ্যে আছে ?

প্র. ৫ নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লেখো।

১. হরপ্পা সভ্যতার সুশৃঙ্খল নগর-বিন্যাস আজকের শহর পরিকল্পনার জন্য আদর্শ হতে পারে কীভাবে, উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখো।

২. হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলির অর্থনীতি কেন পতনের দিকে গিয়েছিল ?

কাজ –

- মাটি, কাদা, পোড়ামাটি প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করে হরপ্পা সভ্যতার কোনো একটি খননস্থলের প্রতিরূপ তৈরি করো।
- হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, ধোলাবীরা, রাখিগড়ি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো এবং তোমার এলাকায় এ বিষয়ে কোন পরিবর্তন দেখা যায় তা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

উপক্রম

১. হরপ্পাযুগীয় সুপরিকল্পিত নগর, বাড়িঘর, রাস্তা, জলব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতিরূপ তৈরি করো।

২. মহারাষ্ট্র সরকারের : *https://water.maharashtra.gov.in/en/scheme/sant-gadgebaba-gram-swachhta-abhiyan/* এই ওয়েবসাইট থেকে সন্ত গাডগেবাবা গ্রাম স্বচ্ছতা অভিযানের তথ্য সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করো।

***

৪ বৈদিক সংস্কৃতি

৪.১ বৈদিক সাহিত্য — ৪.২ বৈদিক কালের লোকজীবন

তোমরা কি কখনো সুডোকু খেলা খেলেছ ?

সুডোকু হলো যুক্তিশক্তি ও সংখ্যাজ্ঞানের সমন্বয়। এই খেলাটি একেবারে আধুনিক কালে তৈরি হয়েছে। নীচের ছকে ১ থেকে ৯ অঙ্ক এভাবে ভরো যাতে প্রত্যেক খাড়া এবং আড়া পংক্তিতে অঙ্ক এক বারই আসবে ?

৮		৩		৭		২	৪	
১				২	৫		৭	৮
		৫	৬			৯		
২			৯				৬	
	৯	৮				৫	৩	
	৩				৮			৭
		১			২	৪		
৯	৫		৭	৪				১
	৮	৬		৩		৭		৯

এখন ভেবে দেখো, হাজার হাজার বছর আগে, যখন কম্পিউটার ছিল না, ক্যালকুলেটর ছিল না, শঙ্করাচার্য শ্রী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ এনার লেখা 'বৈদিক গণিত' এই বইটিতে কিছু সূত্র আছে। সেই সময়ে বৈদিক ঋষিরা গণিতের এমন সূত্র তৈরি করেছিলেন, যার সাহায্যে বড় বড় সংখ্যার অঙ্ক মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করা যেত! সেই সূত্রই হলো বৈদিক গণিত।

আমাদের ৯৮ × ৯৯ অঙ্কটি সমাধান করতে হবে।

বৈদিক গণিতের একটি সূত্র আছে, 'নিখিলং নবতশ্চরমং দশতঃ' –

ধাপ ১

৯৮ – ১০০ (ভিত্তি) = –০২

৯৯ – ১০০ (ভিত্তি) = –০১

ধাপ ২

৯৮ ⤡ –০২

৯৯ ⤢ –০১

সেই অনুযায়ী গুণফল ৯৭০২

(তির্যকভাবে বিয়োগ করো, দুটো থেকেই একই উত্তর পাবে। উত্তর হলো ৯৭, এটি বাঁদিকে লেখো এবং (–০২) × (–০১) = ০২ এটি ডানদিকে লেখো।)

উত্তর : ৯৮ × ৯৯ = ৯৭০২

যে যুগে বিদ্যুৎ, কম্পিউটার ও মোবাইল ছিল না, সেই যুগেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অগ্রগামী একটি সংস্কৃতি আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল। বৈদিক সংস্কৃতি হলো আমাদের ভারতের এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। 'বেদ' নামক গ্রন্থগুলিতে সেই কালের মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করতেন, কী শিখতেন, তাঁদের জীবনধারা কেমন ছিল তার সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

বৈদিক সংস্কৃতির মানুষেরা জ্ঞান কীভাবে অর্জন করেছিলেন ?

বেদ কী ?

সেই কালের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল ?

বৈদিক ঐতিহ্য কি এখনও বিদ্যমান ?

গণিত, বিজ্ঞান, যোগ, আয়ুর্বেদ এই সব বিষয়ে কি তাঁদের জ্ঞান ছিল ?

চলো, আমরা জেনে নিই এই জ্ঞান কোথা থেকে এল এবং আমাদের কাছে কী রেখে গেল।

৪.১ বৈদিক সাহিত্য

'বিদ' অর্থ জানা। এই শব্দ থেকেই বেদ শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ হলো জ্ঞান। বৈদিক সাহিত্য ভারতের প্রাচীনকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। এই সাহিত্য মূলত বেদগুলিতে সংগৃহীত হয়েছে। বেদ হলো প্রাচীনকালের জ্ঞান, ধর্ম, দর্শন ও জীবনধারার প্রধান উৎস। বেদের ঋচাগুলি ঋষিদের মনে স্ফুরিত হয়েছিল। বেদের কিছু সূক্ত নারীরাও রচনা করেছিলেন।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই চারটি বেদ। বেদগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এগুলি প্রধানত মন্ত্র, স্তুতি, যজ্ঞবিধি, দর্শন ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঋগ্বেদ হলো সবচেয়ে প্রাচীন বেদ।

এই চারটি বেদকে সংহিতা বলা হয়। সংহিতা রচনার পরে প্রতিটি বেদের জন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ, আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে এগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ - ব্রাহ্মণগ্রন্থ বেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই গ্রন্থগুলি মূলত যজ্ঞ, পূজন ও ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত। যজ্ঞ কীভাবে করতে হবে, কোন মন্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং তার পেছনে কী অর্থ আছে তার বিস্তারিত বর্ণনা এতে করা হয়েছে।

আরণ্যক - 'আরণ্যক' শব্দটি 'অরণ্য' অর্থাৎ বন শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে, কারণ এই গ্রন্থগুলি

নীচে দেওয়া তালিকাটি শ্রেণীকক্ষে একসাথে পড়ো। এই চারটি বেদের মূল বিষয়, তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে।

ঋগ্বেদ	যজুর্বেদ	সামবেদ	অথর্ববেদ
মূল বিষয় - মন্ত্র, দেবতাদের স্তবন (স্তুতিগান)	মূল বিষয় - যজ্ঞ, হবন, ধর্মীয় বিধান	মূল বিষয় - সংগীত, গায়ন, মন্ত্রপাঠ	মূল বিষয় -জীবনধারা, কৃষি, চিকিৎসা
বৈশিষ্ট্য - অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের স্তোত্র	বৈশিষ্ট্য - যজ্ঞকর্ম, হবনপদ্ধতি	বৈশিষ্ট্য - মন্ত্রের ছন্দবদ্ধ গায়ন	বৈশিষ্ট্য -চিকিৎসা, গার্হস্থ্য, হবনপদ্ধতি
গুরুত্ব - সবচেয়ে প্রাচীন বেদ, দেবতাদের স্তুতিগান ও যজ্ঞের গুরুত্ব শেখায়।	গুরুত্ব - ধর্মীয় বিধান, ধর্মীয় আচার-বিচার শেখায়।	গুরুত্ব - সংগীত ও মন্ত্রের অধ্যয়ন, যজ্ঞে গায়নের গুরুত্ব বোঝায়।	গুরুত্ব - স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য জীবন, জীবনোপযোগী জ্ঞান বিষয়ে পথ দেখায়।

বনে বসবাসকারী সাধকদের জন্য রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলিতে যজ্ঞের গূঢ় অর্থ, ধ্যান, সাধনা ও আত্মজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপনিষদ - উপনিষদ শব্দের অর্থ হলো গুরুর কাছে বসে জ্ঞান অর্জন করা। এই গ্রন্থগুলিতে আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও বিশ্বের দর্শন বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদে দৈনন্দিন জীবনের বাইরে গিয়ে ব্যবহারিক আত্মজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বলো তো দেখি !

১. এই বেদে মূলত দেবতাদের স্তবন আছে। এতে প্রকৃতির দেবতাদের বর্ণনা রয়েছে।

উত্তর ----------------------------------

২. এই বেদে যজ্ঞ করার বিধান ও পদ্ধতি দেওয়া আছে।

উত্তর ----------------------------------

৩. এই বেদের স্তবনগুলি সুরে সুরে গাওয়া হতো। এর শ্লোকগুলি সংগীতসহ আবৃত্তি করা হয়।

উত্তর ----------------------------------

৪. এই বেদকে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বেদ বলে মনে করা হয়, কারণ এতে স্বাস্থ্য ও ঘরোয়া উপায় রয়েছে।

উত্তর ----------------------------------

৪.২ বৈদিক কালের লোকজীবন

বৈদিক কাল দুটি ভাগে বিভক্ত - পূর্ব বৈদিক কাল (একে ঋগ্বেদ কালও বলা হয়) এবং উত্তর বৈদিক কাল।

পূর্ব বৈদিক কাল সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ পর্যন্ত ধরা হয়। এই কালের তথ্য আমরা মূলত ঋগ্বেদ থেকে পাই। এই সময়ের লোকজীবন পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিল। ধীরে ধীরে কৃষির সূচনা হয়েছিল। সেই কালে গরু ছিল প্রধান সম্পদ।

উত্তর বৈদিক কাল হলো খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ পর্যন্ত। এই সময়ে বৈদিক মানুষেরা গঙ্গা উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কৃষি, বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের আরও বিকাশ ঘটে। এই কালেই নগরের উদ্ভব শুরু হয়েছিল।

বৈদিক কাল

পূর্ব বৈদিক কাল	উত্তর বৈদিক কাল
খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ পর্যন্ত	খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০পর্যন্ত

পরিবার ও সমাজব্যবস্থা

বৈদিক কালে পরিবার ছিল সমাজের সবচেয়ে ছোট একক। প্রতিটি পরিবারে বাবা, মা, ছেলেমেয়ে, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা ও অন্যান্য আত্মীয়রা একসাথে বাস করতেন। এখনকার মতোই সেই কালের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ছিল, অর্থাৎ পরিবারের সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছিল পরিবার প্রধানের হাতে। পরিবার প্রধানকে 'গৃহপতি' বলা হতো। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গৃহপতির আদেশ মেনে চলতেন। অনেক পরিবার মিলে গ্রাম তৈরি হতো, আর অনেক গ্রাম মিলে **'জন'** বা রাজ্য গঠিত হতো। গ্রামের প্রধানকে বলা হতো **'গ্রামণী'** এবং রাজ্যের প্রধানকে বলা হতো **'রাজা'**। সমাজের সকলের পক্ষে ধর্ম, সত্য ও ন্যায় মেনে চলা আবশ্যক বলে বিবেচিত হতো। মানুষ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা ও ভালোবাসার সাথে আচরণ করত। প্রতিটি ব্যক্তির সমাজে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও স্থান ছিল। বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ ছিল।

শিক্ষা ও সংস্কার

বৈদিক কালে শিক্ষাকে সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হতো। ছাত্রদের গুরুকুল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হতো, অর্থাৎ তারা গুরুর আশ্রমে থেকে শিখত, গুরুর সামনে বসে অধ্যয়ন করত। ছাত্রদের গুরুকুলে শৃঙ্খলাবদ্ধ

গুরুকুল

জীবনযাপন শেখানো হতো, যাতে তারা জ্ঞান, নৈতিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ নিয়ে সমাজে কাজ করতে পারে। গুরু ছিলেন আদর্শ জীবনযাপনের পথপ্রদর্শক। ছাত্ররা বেদ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, সংগীত, নীতিশাস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন করত। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান অর্জন ছিল না, বরং বিনয়, শৃঙ্খলা, ধর্ম ও আত্মনির্ভরতার মূল্যবোধ আত্মস্থ করাও ছিল।

ভেবে দেখো।

তুমি যদি গুরুকুলে পড়তে, তাহলে তোমার দৈনন্দিন রুটিন কেমন হতো? তার উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

করে দেখো।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গল্পগুলি ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা দিকে আলোকপাত করতে সহায়ক। এগুলি থেকে সমাজের গঠন ও তৎকালীন জীবনের প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ বুঝতে সাহায্য হয়। তোমরাও কিছু গল্প খুঁজে বের করো এবং শ্রেণীকক্ষে সেগুলির নাট্যরূপ উপস্থাপন করো।

আশ্রমব্যবস্থা

প্রাচীন ভারতের বৈদিক সংস্কৃতিতে আশ্রমব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় একজন মানুষের জীবনের চারটি পর্যায় নির্ধারিত ছিল। প্রতিটি আশ্রমে নির্দিষ্ট কর্তব্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা থাকত।

চার আশ্রম

ব্রহ্মচর্যাশ্রম - ব্রহ্মচর্যাশ্রম হলো জীবনের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। এই সময়ে ছাত্র মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করত।

গৃহস্থাশ্রম - শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পরে মানুষ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করত। এতে বিবাহ এবং পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বানপ্রস্থাশ্রম - গৃহস্থাশ্রমে থেকে দায়িত্ব পালনের পর জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিবার থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে ধ্যান, তপস্যা ও দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকা প্রত্যাশিত ছিল।

সন্ন্যাসাশ্রম - সন্ন্যাসাশ্রম হলো জীবনের শেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে মানুষের উচিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে মানবজন্মের অর্থ উপলব্ধির জন্য জীবন যাপন করা। বেশিকাল একই স্থানে না থাকার রীতি ছিল।

করে দেখো।

আশ্রমব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে জীবনপদ্ধতির চারটি পর্যায় বিষয়ে একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরি করো। প্রতিটি পর্যায়ের ছবি, তার কর্তব্য ও গুরুত্বের তথ্য লিখে শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শন করো।

বৈদিক কালের মানুষের জীবন ছিল সাদাসিধে কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাঁদের সত্য, সংযম ও উদারতার মতো মূল্যবোধ মেনে চলতে শেখানো হতো। সমাজে একতা, সহযোগিতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। মানুষ ঋতু অনুযায়ী উৎসব, যজ্ঞ, গীত-সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে জীবনের আনন্দ উদযাপন করত। অন্নধান্য নষ্ট না করা, দরিদ্রদের সাহায্য করা, শৃঙ্খলার সাথে জীবন যাপন করা এগুলি নৈতিক মূল্যবোধের অংশ ছিল। এই নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হতো এবং সেই ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব পরিপক্ব হতো। বৈদিক জীবনধারা ছিল প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শ্রমনির্ভর।

তোমার মত কী ?

আশ্রম ব্যবস্থার ফলে একজন মানুষের জীবনে পরিকল্পনা, নিয়মশৃঙ্খলা, সংযম ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হতে সাহায্য হতো।

দৈনন্দিন জীবন

বৈদিক কালের মানুষের খাবার ছিল সাদা ও পুষ্টিকর। সেই সময়ে মানুষ কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে তাঁদের খাদ্যতালিকায় শস্য, দুধ, দই, ঘি, মধু, ফল ও সবজি অন্তর্ভুক্ত ছিল। যব, গম, চাল, বাজরা প্রভৃতি শস্য তাঁরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতেন। উদ্ভিজ্জ খাবারের ব্যবহার ছিল। ঋতু অনুযায়ী ফল খাওয়া হতো। খাবার শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক হওয়া উচিত এবং সঠিক সময়ে আহার করা উচিত এগুলো ছিল সাধারণ নিয়ম। তাঁদের আহারপদ্ধতি মোটের উপর স্বাস্থ্যকর ও নিয়মনিষ্ঠার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

একটু ভেবে দেখো।

তোমার দৈনন্দিন জীবনে ওঠার সময়, আহার, ব্যায়াম, পড়াশোনা ও বিশ্রামে নিয়মিততা থাকা উচিত এ বিষয়ে তোমার মত কী ?

বৈদিক লোকজীবনে স্বাস্থ্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সুষম আহার, যোগব্যায়াম এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে মানুষ দীর্ঘজীবী ও সুস্থ জীবন যাপন করত।

করে দেখো।

পরিবারের একদিনের খাবারের পরিকল্পনা নিজে তৈরি করো। সেখানে কোন কোন খাবার বেশি স্বাস্থ্যকর এবং কেন এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করো।

বিনোদনের দিক থেকে বৈদিক মানুষেরা সংগীত, নৃত্য, গায়ন, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, গল্প বলা ও দার্শনিক আলোচনায় মেতে থাকত। ধনুর্বিদ্যা, রথচালনা, মল্লযুদ্ধ, পাশার মতো ছকের খেলা এবং আরও নানা খেলা তারা খেলত। উৎসব ও ধর্মীয় মেলা ছিল সামাজিক ঐক্য রক্ষার এবং বিনোদনের প্রধান মাধ্যম।

বৈদিক কালে সংগীতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হতো। সংগীত কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিল না বৈদিক পাঠে সুরের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। সংগীত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এবং লোক-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। মন্ত্রোচ্চারণের জন্য সুরের জ্ঞান আবশ্যক ছিল। সামবেদ বিশেষভাবে সংগীতের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সেই কালে বীণা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। এই যন্ত্রগুলি যজ্ঞ, নৃত্য ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হতো। পুরুষ ও নারী উভয়ই গায়ন ও নৃত্যে অংশ নিত। বৈদিক কালের সংগীত ছিল ভক্তি, আনন্দ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। সেখান থেকেই পরবর্তীকালে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারা বিকশিত হয়েছে।

নারীদের স্থান : পূর্ব বৈদিক কালে নারীরা সমাজে সমান মর্যাদা পেতেন। তাঁদের শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁরা পুরুষের মতোই বেদাধ্যয়নের সুযোগ পেতেন। অনেক নারী বিদুষী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লোপামুদ্রা, ঘোষা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা এঁরা ছিলেন সেই কালের কয়েকজন বিখ্যাত বিদুষী নারী। নারীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। তবে উত্তর বৈদিক কালে সমাজ আরও বেশি পিতৃতান্ত্রিক হয়ে পড়ে, নারীদের শিক্ষায় বাধানিষেধ আসে এবং তাঁদের স্বাধীনতা কমে যায়। ধীরে ধীরে তাঁদের উপর নানা বিধিনিষেধ বাড়তে থাকে। পরিবারে ও সমাজে তাঁদের স্থান ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক জীবন : এই কালের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন মূলত কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিল। গম, যব, চাল ও অন্যান্য শস্য

তারা চাষ করত। বৈদিক কালে পশুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। গরু, বলদ, ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগল ছিল প্রধান প্রাণী। গরু ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। ঘোড়া যুদ্ধে ও যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হতো, আর বলদ চাষ ও পরিবহনের কাজে লাগত।

কৃষি ছাড়াও আরও অনেক পেশা প্রচলিত ছিল। পশুপালন, ধাতুশিল্প, কুম্ভকার, তাঁতশিল্প, স্বর্ণশিল্প ও রথ নির্মাণ ছিল। বাণিজ্য ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল। বস্তুবিনিময় পদ্ধতিতে লেনদেন হতো। কিছু জায়গায় ছোট বাজার গড়ে উঠেছিল। নৌ চলাচল ও নদীপথে বাণিজ্যের উল্লেখও পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী ও কারিগররা ছিলেন সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁদের স্বতন্ত্র সংঘ 'শ্রেণী' নামে পরিচিত ছিল। তাঁদের প্রধানকে বলা হতো 'শ্রেষ্ঠী'।

ধর্মীয় জীবন : বৈদিক কালের মানুষের ধর্ম প্রকৃতিপূজার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। বৈদিক মানুষেরা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে দেবতার মর্যাদা দিয়েছিলেন। যেমন - অগ্নি, বরুণ, মরু (বায়ু), সূর্য, উষা (ভোরবেলা), পৃথিবী, সোম (চন্দ্র)। ইন্দ্র সবচেয়ে শক্তিশালী দেবতা বলে বিবেচিত হতেন। যজ্ঞে অর্পিত হবি (আহুতি) অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের কাছে পৌঁছায় - এমন বিশ্বাস ছিল। যজ্ঞে অন্ন, ঘি ও শস্য হবি হিসেবে অর্পণ করা হতো। বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করা হতো। ধর্মের ভিত্তি ছিল সত্য, ন্যায় ও 'ঋতু' অর্থাৎ প্রকৃতির চক্র অক্ষুণ্ণ রাখার নীতির উপর।

তোমরা জানো কী ?

ভারতীয় নৌসেনার মনোগ্রামে যে শ্রীবাক্য রয়েছে তা হলো 'শং নো বরুণঃ' এটি উপনিষদের একটি শ্লোকের উপর ভিত্তি করে গড়া। এই বাক্যের অর্থ হলো বরুণ দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। নৌসেনা এই বাক্যের মাধ্যমে জলের নিয়ন্ত্রক ও সমুদ্রপথের পথপ্রদর্শক বরুণ দেবতাকে সম্মান জানিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার পরে নৌসেনা প্রধানের মনোগ্রাম নির্ধারণের সময় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল সি. গোপালাচারী এই শ্রীবাক্যটি প্রস্তাব করেছিলেন। ভারতীয় নৌসেনার নতুন প্রতীক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজমুদ্রা থেকে অনুপ্রাণিত।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা : বৈদিক কালের সমাজে রাজার স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজা কেবল ক্ষমতার অধিকারী নন, তিনি ধর্ম ও ন্যায়ের পালনকারী হবেন এটাই ছিল আদর্শ রাজার ধারণা। রাজার সিদ্ধান্তে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দুটি সংস্থা কাজ করত। সেগুলিকে 'সভা' ও 'সমিতি' বলা হতো। সভা ছিল প্রবীণ ব্যক্তিদের মণ্ডল, যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতেন। সমিতি ছিল গ্রাম বা সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে আলোচনার জন্য আয়োজিত সভা। এ ছাড়া 'বিদথ' ও 'জন' নামক সংস্থাও রাজাকে পথ দেখাত। সভা ও বিদথের কাজে নারীরাও অংশ নিতেন।

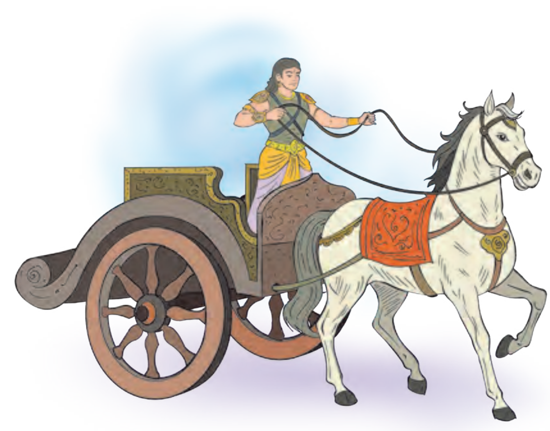

বেদকালীন রথ

রাজ্যশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সহায়তার জন্য রাজা কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। **পুরোহিত, সেনাপতি ও সভাপতি ছিলেন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা।** কর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত 'কর্মকর্তাকে' বলা হতো ভাগদুঘ। 'জন'-এর আয় থেকে রাজার 'ভাগ' সংগ্রহ করতেন তিনি। যুদ্ধকালে রাজা নিজেই সেনার নেতৃত্ব দিতেন। রাজকার্য মূলত ধর্ম, ন্যায়, রক্ষা ও সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার নীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতো।

বৈদিক কালে রাজা রাজ্যের প্রধান হলেও তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ছিল না। সভা ও সমিতির পরামর্শ নিয়েই তাঁকে রাজকার্য পরিচালনা করতে হতো।

অনুশীলনী

প্র. ১ অ) এক কথায় উত্তর লেখো।

১. বিদ অর্থ ------------------------------

২. গুরুর কাছে বসে জ্ঞান অর্জন করা মানে ------------------------------

৩. প্রবীণ ব্যক্তিদের মণ্ডল মানে ---------------

ব) জোড়া মেলাও।

'ক' দল	'খ' দল
১) ঋগ্বেদ	অ)যজ্ঞে মন্ত্রের গায়ন
২) যজুর্বেদ	আ)স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
৩) সামবেদ	ই)দেবতাদের স্তবন
৪) অথর্ববেদ	ঈ)যজ্ঞবিধির বর্ণনা

প্র. ২ অ) ধারণাচিত্র সম্পূর্ণ করো।

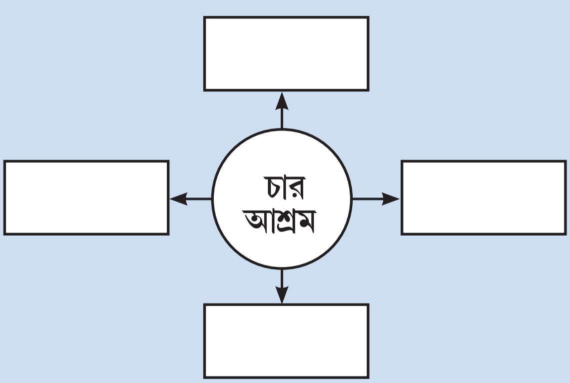

ব) টীকা লেখো।

১. বৈদিক কালের শিক্ষাব্যবস্থা

২. বৈদিক কালের অর্থনৈতিক জীবন

৩. নারীদের স্থান

প্র. ৩ অ) নীচের বিবৃতিগুলি কারণসহ ব্যাখ্যা করো।

১. বৈদিক সংস্কৃতিতে কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো।

২. বৈদিক কালের সমাজে নারীদের স্থান সম্মানজনক ছিল।

ব) বৈদিক কালের বিনোদনের মাধ্যম ও বর্তমান কালের বিনোদনের মাধ্যমের মধ্যে মিল ও পার্থক্যের বিষয়গুলি লেখো।

প্র. ৪ বৈদিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর নীচের তালিকাটি সম্পূর্ণ করো।

পদসংস্থা	কাজ
সভা	------------------------------
সমিতি	------------------------------
ভাগদুঘ	------------------------------

প্র. ৫ যোগসাধনা করলে আমাদের জীবনধারায় কোন কোন পরিবর্তন আসতে পারে?

উপক্রম

- শিক্ষার প্রতি মনেপ্রাণে নিবেদিত শিষ্য একলব্যের কাহিনির নাট্যরূপ তৈরি করে উপস্থাপন করো।
- ইন্টারনেটের সাহায্যে বেদের শ্লোকের একটি সংকলন তৈরি করো।
- ভারতীয় বায়ুসেনা ও স্থলসেনার মনোগ্রাম ও শ্রীবাক্যগুলি সংগ্রহ করে কার্যক্রম খাতায় লেখো।

***

৫ বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা

৫.১.বৈদিক ধর্ম
৫.২.জৈন ধর্ম
৫.৩.বৌদ্ধ ধর্ম
৫.৪.ইহুদি ধর্ম
৫.৫.খ্রিস্টান ধর্ম
৫.৬.ইসলাম ধর্ম
৫.৭.পারসি ধর্ম

ভারত হল ধর্মীয় বৈচিত্র্যের দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তার ঘটেছে। বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম এবং পারসি এই সকল ধর্মের ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। পরবর্তী মধ্যযুগে শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিটি ধর্মের শিক্ষায় মৌলিক জীবনমূল্য, সহিষ্ণুতা, ন্যায় এবং নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই ধর্মীয় বৈচিত্র্য ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতিকে এক বিশেষ পরিচয় দেয়। সর্বসমাবেশিতা হল ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক গুণ। এই গুণের কারণেই আমাদের দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

প্রাচীন ভারতে কোন কোন ধর্মের প্রসার হয়েছিল ?

এই বিভিন্ন ধর্মের দর্শন আমাদের কী শেখায় ?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পেতে, এই অধ্যায়ে আমরা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মের দর্শন, শিক্ষা এবং সেই ধর্মগুলির আচার-পদ্ধতির সাথে পরিচিত হব।

প্রাচীন ভারতে ধর্মের অস্তিত্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক চিন্তাকে গুরুত্ব দিত। সেখানে জীবনের চরম লক্ষ্য অর্জন, সত্যের অনুসরণ এবং সহিষ্ণুতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রাচীন ভারতে অনেক ধর্মের প্রসার হয়েছিল। বৈদিক ধর্ম হল শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ বেদের উপর ভিত্তি করে রচিত বৈদিক সাহিত্য এবং পুরাণ অনুযায়ী আচরণকারী ধর্ম। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম হল প্রাচীন ধর্মপ্রবাহ। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম ভারতে প্রবেশ করে। ইসলাম ও পারসি ধর্মের অনুগামীরা খ্রিস্টীয় প্রায় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে এসেছিল।

ভেবে দেখো।

তোমার পরিবারের ধর্মীয় উৎসব, পূজা, রীতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ঠাকুরমা-ঠাকুরদা অথবা মা-বাবার কাছ থেকে জেনে নাও। এই উৎসব পালন করা, রীতি-ঐতিহ্য মেনে চলার পেছনে কী যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে, তা নিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা করো।

৫.১ বৈদিক ধর্ম

বৈদিক ধর্মকে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম বলে মনে করা হয়। বেদসাহিত্য এই ধর্মের মূল ভিত্তি। বৈদিক মানুষেরা যজ্ঞ, প্রকৃতি-উপাসনা এবং সেই উপলক্ষে বেদের মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিতো। প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন ছিল সহজ-সরল।

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সেই জীবন গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সত্য কথা বলা, পরিবারের বড়দের সম্মান করা, সম্পর্কের মান রক্ষা করা এবং অন্যের ক্ষতি হয় এমন আচরণ না করার উপর জোর দেওয়া হত। কালক্রমে এই আচার-অনুষ্ঠানগুলি আরও জটিল হয়ে উঠল।

বৈদিক ধর্মের প্রধান গ্রন্থগুলির মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র রয়েছে। বেদে যজ্ঞ, মন্ত্র ও দেবতাদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে। উপনিষদের দর্শনে আত্মা, ব্রহ্ম, জীবনের উদ্দেশ্য ও মোক্ষের আলোচনা আছে। সেই অনুযায়ী, মানবজীবন, প্রকৃতি ও বিশ্ব এই সবই একই পরব্রহ্ম-এর প্রকাশ। তাকেই 'তৎ' বলা হয়। এই ভাবনা দুটি বিখ্যাত বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে।

সেই দুটি বাক্য হল:

অহং ব্রহ্মাস্মি - আমিই ব্রহ্ম।

তৎ ত্বম্ অসি - তুমিও সেই (তুমিই তত।)

হিন্দু ধর্ম হল বৈদিক ধর্মের আরও ব্যাপক রূপ। হিন্দু ধর্ম বেদের জ্ঞান রক্ষা করেছে এবং একই সাথে ভক্তি, দর্শন ও মোক্ষের ধারণাকেও প্রচলিত করেছে। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে, প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ তার কর্মের উপর নির্ভর করে। ধর্ম মানে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। সত্য, নৈতিকতা, কর্তব্যপালন ও সমাজসেবার মূল্যবোধ মেনে চলাই মানুষের সহজাত ধর্ম। এই মূল্যবোধ অনুযায়ী চলাই ধর্মপালন। যজ্ঞ-হোম, উপাসনা-পূজা, উৎসব পালন এই সব কিছুই হিন্দু ধর্মের জীবনশৈলীর অংশ। ধর্মপালন ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের মধ্যে হিন্দু জীবনশৈলীতে একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও ধর্মজীবন ও ব্যবহারিকতার সমন্বয় দেখা যায়।

'ভগবদ্গীতা' হল হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ। ফলের আশা না করে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে, এই কথা এতে বলা হয়েছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা গ্রন্থের উপর ভাষ্য রচনা করে তিনি সেগুলির অর্থ স্পষ্ট করেছিলেন। তিনি ভারতের চার দিকে বদরিনাথ, দ্বারকা, জগন্নাথপুরী এবং শৃঙ্গেরিতে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন।

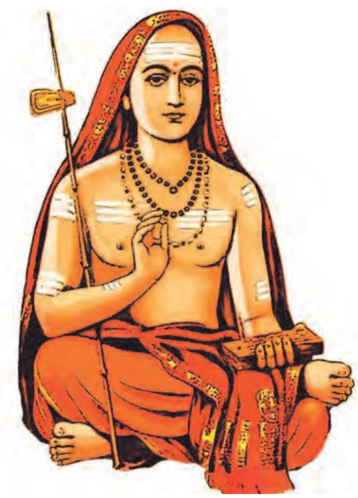

আদি শঙ্করাচার্য

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ - সকলে সুখী হোক।

সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ - সকলে রোগমুক্ত থাকুক।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তুঃ - সকলে কল্যাণকর বিষয় দর্শন করুক।

মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্‌ভবেৎ - কেউ যেন দুঃখী না হয়। এই সংস্কৃত শ্লোকের পঙক্তিগুলিতে সকল প্রাণীর কল্যাণ হোক, এই ভাবনা এবং তাদের প্রতি করুণা প্রকাশিত হয়েছে।

করে দেখো।

"সাত দিনে তুমি যে ভালো কাজগুলি করেছ"- তা তোমার নোটবুকে লিখে রাখো। উদাহরণ স্বরূপ বন্ধুকে সাহায্য করেছি, বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছি, গাছে জল দিয়েছি ইত্যাদি। সপ্তাহের শেষে শ্রেণীতে বলো এই কাজ গুলি করতে গিয়ে আমি কী শিখলাম ?

তোমরা জানো কী ?

ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যে বিভিন্ন মতপ্রবাহ থেকে ছয়টি প্রধান চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে। এগুলিকে ষড়দর্শন বলা হয়। ভারতীয় দর্শনে এই ছয়টি দর্শনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন শব্দের অর্থ হল দর্শনশাস্ত্র বা তত্ত্বজ্ঞান।

ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্ত এই ছয়টি দর্শন অন্তর্ভুক্ত। এই দর্শনগুলিতে বিশ্বের তত্ত্বজ্ঞান, সৃষ্টি, আত্মা ও মোক্ষের মতো মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়।

১. **সাংখ্য দর্শন :** এই দর্শনে বিশ্বের উৎপত্তি কীভাবে হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।
২. **যোগ দর্শন :** এই দর্শন সুস্থ শরীরের জন্য সাধনা ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভের উপর জোর দেয়।
৩. **ন্যায় দর্শন :** এই দর্শন তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
৪. **বৈশেষিক দর্শন :** বিশ্ব পরমাণু দিয়ে তৈরি এটি এই দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।
৫. **পূর্বমীমাংসা দর্শন :** এই দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করে।
৬. **বেদান্ত দর্শন :** বেদান্ত দর্শন উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

৫.২. জৈন ধর্ম

জৈন ধর্ম ভারতের প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে একটি। এই ধর্মে অহিংসা তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যিনি ধর্মজ্ঞান প্রকাশ করেন, জৈন ধর্মে তাঁকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী মোট ২৪ জন তীর্থঙ্কর হয়ে গেছেন। বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মের ঐতিহ্যে চব্বিশতম তীর্থঙ্কর।

বর্ধমান মহাবীর (খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ - খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭)

আজ যে রাজ্যকে আমরা বিহার নামে জানি, সেই রাজ্যে প্রাচীনকালে বৃজ্জি নামে একটি মহাজনপদ ছিল। তার রাজধানী ছিল বৈশালী। বৈশালী নগরের একটি অংশ কুণ্ডগ্রামে বর্ধমান মহাবীরের জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবার নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মায়ের নাম ছিল ত্রিশলা।

বর্ধমান মহাবীর জ্ঞানলাভের জন্য ঘর-সংসার ত্যাগ করেছিলেন। সাড়ে বারো বছর তপস্যার পর তিনি জ্ঞান লাভ করেন। এই জ্ঞান 'কেবল' অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ' প্রকৃতির ছিল, তাই তাঁকে 'কেবলী' বলা হয়। শরীরের জন্য সুখদায়ক বিষয়ে আনন্দ এবং কষ্টদায়ক বিষয়ে যন্ত্রণা - এই কোনোটিকেই নিজের উপর প্রভাব ফেলতে না দেওয়া, অর্থাৎ বিকারের উপর জয়লাভ করা। তিনি এই জয় অর্জন করেছিলেন, তাই তাঁকে 'জিন' অর্থাৎ 'জয়ী', বলা হয়েছিল। 'জিন' শব্দ থেকে জৈন শব্দটি তৈরি হয়। বিকারের উপর জয়ী মহান বীর হিসেবে বর্ধমানকে মহাবীর বলা হয়। জ্ঞানলাভের পর মানুষকে ধর্ম বোঝানোর জন্য তিনি প্রায় ত্রিশ বছর উপদেশ দিয়েছিলেন।

বর্ধমান মহাবীর

মানুষ যাতে সহজে ধর্ম বুঝতে পারে সেজন্য বর্ধমান মহাবীর অর্ধমাগধী এই জনভাষায় মানুষের সাথে কথা বলতেন। তাঁর বলা ধর্ম ছিল বিশুদ্ধ আচরণের উপর জোর দেওয়া। বিশুদ্ধ আচরণের জন্য তাঁর বলা পথের সারকথা পঞ্চমহাব্রত এবং

ত্রিরত্নের মধ্যে নিহিত। তীর্থঙ্করদের উপদেশ দেওয়ার জন্য যে সভা হত, অর্ধমাগধী ভাষায় তাকে ‘সমবসরণ’ বলা হত। এই সমবসরণ সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সমবসরণে সকল বর্ণের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল।

পঞ্চমহাব্রত : পঞ্চমহাব্রত মানে অত্যন্ত কঠোরভাবে পালনীয় পাঁচটি নিয়ম।

১. অহিংসা : কোনো প্রাণীর ক্ষতি হবে বা হিংসা হবে এমন আচরণ করা উচিত নয়।

২. সত্য : প্রতিটি কথা ও কাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

৩. অস্তেয় : ‘স্তেয়’ মানে চুরি। অন্যের মালিকানার বা অধিকারের জিনিস মালিকের অনুমতি ছাড়া নেওয়াই চুরি। চুরি না করাই অস্তেয়।

৪. অপরিগ্রহ : বিষয়-সম্পত্তি সঞ্চয় ও ভোগের প্রতি মানুষের যে মোহ বা আসক্তি থাকে, তা ত্যাগ করাই হলো অপরিগ্রহ।

৫. ব্রহ্মচর্য : শরীরের জন্য সুখদায়ক বিষয় ত্যাগ করে ব্রতপালন করাই ব্রহ্মচর্য।

ত্রিরত্ন : ত্রিরত্ন মানে ১. সম্যক্ দর্শন, ২. সম্যক্ জ্ঞান এবং ৩. সম্যক্ চরিত্র এই তিনটি তত্ত্ব। সম্যক্ শব্দের অর্থ সুষম বা সঠিক।

১. সম্যক্ দর্শন : তীর্থঙ্করের উপদেশে সত্য জেনে তার উপর বিশ্বাস রাখা।

২. সম্যক্ জ্ঞান : তীর্থঙ্করের উপদেশ ও দর্শনের নিয়মিত অধ্যয়ন করে তার গভীর অর্থ বোঝা।

৩. সম্যক্ চরিত্র : পঞ্চমহাব্রতের কঠোর আচরণ করা।

উপদেশের সারকথা : মহাবীরের উপদেশে ‘অনেকান্তবাদ’ নামক সিদ্ধান্তকে সত্যের সন্ধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অনেকান্ত শব্দে অন্ত-এর অর্থ দিক বা পার্শ্ব।

সত্যের সন্ধান করার সময় কোনো বিষয়ের কেবল একটি বা দুটি দিকে মনোযোগ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছালে সত্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। তাই সেই বিষয়ের অনেক দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তে এই কথা মনে করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সমাজে নিজের মত সম্পর্কে গোঁড়ামি থাকে না। অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা তৈরি হয়।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার বর্ণের উপর নয়, তার উত্তম চরিত্রের উপর নির্ভর করে এই ছিল বর্ধমান মহাবীরের শিক্ষা। বৈদিক পরম্পরায় মেয়েদের জ্ঞানলাভের পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্ধমান মহাবীর মেয়েদেরও সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার দিয়েছিলেন। সকল প্রাণীকে ভালোবাসো, মনে অপরের প্রতি দয়া ও করুণা রাখো, বাঁচো এবং বাঁচতে দাও এই উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন।

ভেবে দেখো।

‘সত্য বলা’ এই তত্ত্বটি আচরণে আনার উপকারিতা আজকের যুগে কীভাবে হবে?

‘প্রেম ও দয়া’ এই দর্শনের আধুনিক সমাজে কীভাবে কাজে লাগবে?

‘অহিংসা’ তত্ত্বের বর্তমান কালে কী গুরুত্ব আছে?

নাগরিক হিসেবে আমরা এই তত্ত্বটি কীভাবে আচরণে আনতে পারি?

৫.৩. বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ভারতে এবং ভারতের বাইরে অনেক দেশে হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

গৌতম বুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ - খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩)

গৌতম বুদ্ধের জন্ম নেপালের লুম্বিনী বনে হয়েছিল। তাঁর বাবার নাম শুদ্ধোদন এবং মায়ের নাম মহামায়া (মায়াদেবী)। গৌতম বুদ্ধের আসল নাম ছিল সিদ্ধার্থ। মানবজীবনের সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁর হয়েছিল বলেই তাঁকে ‘বুদ্ধ’ বলা হয়।

গৌতম বুদ্ধ

মানবজীবনে দুঃখ কেন হয় - এই প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল। তার উত্তর খুঁজতে তিনি ঘর-সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এক বৈশাখী পূর্ণিমায় বিহারের গয়া শহরের কাছে উরুবেলা নামক স্থানে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে তিনি ধ্যানে বসেছিলেন। সেই সময় তিনি 'জ্ঞান' লাভ করেন। সেই অশ্বত্থ গাছকে এখন 'বোধিবৃক্ষ' বলা হয়। তেমনই 'উরুবেলা' স্থানটিকে 'বোধগয়া' বলা হয়। তিনি প্রথম প্রবচন দিয়েছিলেন বারাণসীর কাছে সারনাথে। এই প্রবচনে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাকে 'ধম্ম' বলা হয়। এই প্রবচনের মাধ্যমে তিনি ধম্মের চাকাকে গতি দিয়েছিলেন বলে এই ঘটনাকে পালি ভাষায় 'ধম্মচক্কপবত্তন' বলা হয়। সংস্কৃতে তাকে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' বলা হয়।

পরবর্তীকালে তিনি ধম্মের উপদেশ দিতে প্রায়

বোধিবৃক্ষ

পঁয়তাল্লিশ বছর পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর উপদেশ পালি এই জনভাষায় দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধম্মে বুদ্ধ, ধম্ম এবং সঙ্ঘ এই তিনটিকে শরণ নেওয়ার ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণাকে 'ত্রিশরণ' বলা হয়। তাঁর বলা ধম্মের সারকথা নিম্নরূপ।

আর্যসত্য : মানবজীবনের সকল ব্যবহারের মূলে চারটি সত্য রয়েছে। সেগুলিকে আর্যসত্য বলা হয়েছে।

১. দুঃখ : মানবজীবনে দুঃখ আছে।

২. দুঃখের কারণ : দুঃখের কারণ আছে।

৩. দুঃখ-নিবারণ : দুঃখ দূর করা যায়।

৪. প্রতিপদ : প্রতিপদ মানে পথ। এটি দুঃখের অবসানের পথ। এই পথ বিশুদ্ধ আচরণের পথ। এই পথকে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়েছে।

পঞ্চশীল : গৌতম বুদ্ধ পাঁচটি নিয়ম পালন করতে বলেছিলেন। সেই নিয়মগুলিকেই 'পঞ্চশীল' বলা হয়।

১. প্রাণী হত্যা না করা।

২. চুরি করা থেকে দূরে থাকা।

৩. অনৈতিক আচরণ থেকে দূরে থাকা।

৪. মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকা।

৫. মাদকদ্রব্য সেবন থেকে দূরে থাকা।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ : তাঁর ধম্মের উপদেশ দেওয়ার জন্য তিনি ভিক্ষুদের সঙ্ঘ তৈরি করেছিলেন। গৃহস্থজীবন ত্যাগ করে সঙ্ঘে প্রবেশকারী তাঁর অনুগামীদের 'ভিক্ষু' বলা হয়। বুদ্ধের মতো ভিক্ষুরাও পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে মানুষকে ধম্মের উপদেশ দিতেন। মহিলাদের স্বতন্ত্র সঙ্ঘ ছিল। তাদের 'ভিক্ষুণী' বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে সকল বর্ণ ও জাতির মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল।

তোমরা জানো কী ?

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

১. সম্যক্ দৃষ্টি : চার আর্যসত্যের জ্ঞান।

২. সম্যক্ সংকল্প : হিংসা প্রভৃতি তত্ত্বের ত্যাগ।

৩. সম্যক্ বাচা : মিথ্যা, পরনিন্দা, কঠোরতা এবং অর্থহীন বকবকানি না করা।

৪. সম্যক্ কর্মান্ত : প্রাণী হত্যা, চুরি এবং স্বৈরাচার থেকে দূরে থাকা।

৫. সম্যক্ আজীব : জীবিকা অন্যায় পথে নয়, সঠিক পথে অর্জন করা।

৬. সম্যক্ ব্যায়াম : ব্যায়াম মানে প্রচেষ্টা করা। মন্দ কর্ম যেন উৎপন্ন না হয় উৎপন্ন হলে তা ত্যাগ করতে হবে ভালো কর্ম যেন উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হলে তা যেন নষ্ট না হয় এজন্য চেষ্টা করা।

৭. সম্যক্ স্মৃতি : মন একাগ্র করে লোভ প্রভৃতি বিকার দূর করা এবং নিজের চিত্ত প্রভৃতিকে সঠিকভাবে বোঝা।

৮. সম্যক্ সমাধি : চিত্ত একাগ্র করে ধ্যানের অভিজ্ঞতা নেওয়া।

উপদেশের সারকথা : গৌতম বুদ্ধ মানুষের বুদ্ধির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বর্ণ প্রভৃতির ভিত্তিতে মানা বৈষম্য তিনি অস্বীকার করেছিলেন। জন্মে কেউ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হয় না, আচরণের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা নির্ধারিত হয়। ‘ছোট্ট চড়াই পাখিটিও তার নিজের বাসায় স্বচ্ছন্দে চিঁউ-চিঁউ করে গান গায়’ - এটাই তাঁর বিখ্যাত উক্তি। এটি স্বাধীনতা ও সাম্য মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর চিন্তন প্রকাশ করে। পুরুষের মতো মেয়েদেরও নিজের উন্নতি করার অধিকার আছে বলে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। যজ্ঞের মতো কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর উপদেশিত প্রজ্ঞা, শীল, করুণা প্রভৃতি মূল্যবোধ মানুষের কল্যাণসাধনকারী। সকল প্রাণীর প্রতি ‘করুণা’ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বলো তো দেখি !

গৌতম বুদ্ধের উপদেশিত সহিষ্ণুতা কেবল ভারতীয় সমাজের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য আজও কেন পথপ্রদর্শক ?

করে দেখো।

জাতক কথার মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা সহজে বোঝা যায়। এর থেকে আমরা নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনের শিক্ষা পাই। তোমার গ্রন্থাগারে পাওয়া বই থেকে অথবা ইন্টারনেটের সাহায্যে একটি জাতক কথা বেছে নাও এবং শ্রেণীতে তা উপস্থাপন করো।

লোকায়ত : লোকায়ত বা চার্বাক নামে পরিচিত প্রাচীন চিন্তাধারাটি ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি স্বাধীন চিন্তার উপর জোর দিত। এটি বেদের কৃত্ত্ব কে প্রত্যাখান করেছিল।

প্রাচীন কালে ভারতীয় মাটিতে ক্রমাগত নতুন ধারণার সম্ভব ঘটছিল। কালক্রমে ইহুদি ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম এবং পারসি ধর্মের মত ধর্মগুলি ভারতীয় সমাজে সমন্বয় ঘটিয়েছে।

৫.৪ ইহুদি ধর্ম

ইহুদি মানুষদের সাথে ভারতের সম্পর্ক দুই হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন। ইহুদিরা প্রথমে ভারতে ব্যবসার জন্য এসেছিল। একেশ্বরবাদী মানে তারা বিশ্বাস করেন ঈশ্বর একজনই। এই ধর্মকে ‘ইহুদি’ ধর্মও বলা হয়।

সিনাগগ

‘তোরাহ’ হল ইহুদি ধর্মের প্রধান গ্রন্থ। এতে ধার্মিক

ও নৈতিক নিয়ম বলা আছে। তাদের প্রার্থনাস্থলকে সিনাগগ বলা হয়। ন্যায়, সত্য ও সততা এগুলি ঈশ্বরপ্রদত্ত নিয়ম এবং জীবন যাপনের মূল দিকনির্দেশক তত্ত্ব বলে মনে করা হয়। তাদের প্রার্থনাস্থলকে সিনাগগ বলা হয়।

৫.৫. খ্রিস্টান ধর্ম

যীশু খ্রিস্ট খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এই ধর্ম সম্পূর্ণ বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। যীশু খ্রিস্টের ১২ শিষ্যের এক শিষ্য সেন্ট টমাস খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কেরালার মালাবার উপকূলে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়। ইনি ত্রিচুর জেলার পল্লয়ুর ই.স. ৫২ তে চর্চ স্থাপনা করেন। এই ধর্মে একজনই ঈশ্বর মানা হয়। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও দয়াশীল বলে বিশ্বাস করা হয়। যীশু খ্রিস্টের শিক্ষায় প্রেম তত্ত্বটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, তোমার শত্রুকেও ভালোবাসো এবং ক্ষমা করো, কারণ ক্ষমাই প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি। তাঁর মতে, মানুষকে সত্য, সততা ও সেবার পথে চলতে হবে। গরিব, অসুস্থ ও দুঃখী মানুষের সেবা করাই প্রকৃত ধর্মকার্য। 'বাইবেল' হল খ্রিস্টান ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। তাদের প্রার্থনাস্থলকে 'চার্চ' বলা হয়।

চার্চ

করে দেখো।

একটি কাগজে সকল ধর্মের ইতিবাচক বার্তাগুলি লেখো এবং একে অপরকে দাও। সকলে একসাথে সেই ইতিবাচক বার্তাগুলির একটি শৃঙ্খলা তৈরি করো এবং শ্রেণীতে পাঠ করো।

৫.৬. ইসলাম ধর্ম

ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম। আল্লাহ একজনই এবং মুহম্মদ পয়গম্বর তাঁর প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বরের বার্তা পয়গম্বরের মাধ্যমে পবিত্র 'কুরআন' ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'শান্তি'। এই শব্দের অর্থ 'আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ' এটিও হয়। সর্বকালে ও সর্বত্র কেবল আল্লাহই আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু এই কথা ইসলামে বলা হয়েছে। মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর ইবাদত করা, এই কথা মানা হয়। মানুষ জীবনে কীভাবে চলবে তার দিকনির্দেশনা পবিত্র 'কুরআন' ধর্মগ্রন্থে করা হয়েছে। ভারত ও আরবের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আরবের ব্যবসায়ীরা কেরালার উপকূলের বন্দরগুলিতে আসতেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের প্রসার হয়। সেই শতাব্দীতেই আরবি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ভারতে ইসলামের আগমন হয়। ইসলাম ধর্মের প্রার্থনাস্থলকে মসজিদ বলা হয়।

মসজিদ

৫.৭. পারসি ধর্ম

পারসিরা ও বৈদিক সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে সম্পর্ক ছিল। পারসি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের নাম 'আবেস্তা'। 'ঋগ্বেদ' ও 'আবেস্তার' ভাষায় মিল আছে। পারসিরা ইরানের 'পার্স' বা 'ফার্স' নামক প্রদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন বলে তাদের 'পারসি' নামে চেনা যায়। তারা প্রথমে গুজরাটে এসেছিলেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তারা এসেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। জবদুস্ত পারসি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। 'আহুরা মজদ' নামে তাদের

ঈশ্বরের উল্লেখ করা হয়। পারসি ধর্মে অগ্নি ও জল এই দুটি তত্ত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের মন্দিরে পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। সেই মন্দিরগুলিকে 'অগিয়ারি' বলা হয়। উত্তম চিন্তা, উত্তম বাণী ও উত্তম কর্ম এই তিনটি প্রধান আচরণতত্ত্ব পারসি চিন্তাধারার মূল।

অগিয়ারি

পারসি ধর্মের দর্শন কী বলে:

"জগতে ভালো ও মন্দের লড়াই চিরকাল চলতে থাকে। মানুষকে সর্বদা ভালোর পথ বেছে নিতে হবে।"

করে দেখো।

'ধর্মীয় ঐক্য' ও সমরসতা এই বিষয়ের উপর পোস্টার বা চার্ট তৈরি করো, তাতে বিভিন্ন ধর্মের দর্শনের অন্তর্ভুক্তি থাকুক। শ্রেণীতে তার প্রদর্শনী করো।

ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এই সূত্র প্রোথিত হয়ে আছে। এর অর্থ চরম সত্য একটিই, তাকে অনেক নামে ডাকা হয়। তাই ভারতীয় সমাজ সবসময়ই সকলকে সামিল করে নিয়েছে। সকল ধর্ম ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই ধর্মগুলির অনুগামীরা সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক সৌহার্দ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ভাবনাকে উৎসাহিত করেছেন। ধর্মীয় বৈচিত্র্যময় ভারত আজও এই সকল ধর্মের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ এবং অন্য ধর্মের সাথে সহিষ্ণুতায় বেঁচে থাকাই এর বৈশিষ্ট্য।

তোমরা জানো কী ?

'প্রতিটি ধর্মের দর্শন জীবনের নৈতিকতার উপর, শান্তির উপর এবং সমাজের ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

অনুশীলনী

প্র. ১ ক) এক শব্দে উত্তর লেখো।

১. ভারতীয় সংস্কৃতির সহজাত গুণ -------------
২. জৈন ধর্মে যিনি ধর্মজ্ঞান প্রকাশ করেন -------------
৩. গৌতম বুদ্ধ বারাণসীর কাছে এখানে প্রথম প্রবচন দিয়েছিলেন -------------
৪. ইহুদি ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ -------------
৫. ইসলাম ধর্মের প্রার্থনাস্থল -------------

প্র. ২ ক) ছক পূরণ করো।

ধর্ম	ধর্মগ্রন্থ	প্রার্থনাস্থল
-----------	-----------	সিনাগগ
-----------	বাইবেল	-----------
-----------	-----------	মসজিদ
-----------	আবেস্তা	-----------

খ)

দর্শন	ব্যাখ্যা
-----------	বিশ্বের উৎপত্তি কীভাবে হয়, তার বিবরণ
যোগদর্শন	-----------
-----------	তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত
বৈশেষিক দর্শন	-----------
-----------	বেদের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ
বেদান্ত দর্শন	-----------

গ) ঘটনাগুলি কালক্রমানুসারে সঠিক ক্রমে সাজাও।

১. গৌতম বুদ্ধ ভ্রমণ করে মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

২. গৌতম বুদ্ধের জন্ম লুম্বিনীতে হয়েছিল।

৩. বোধগয়ায় বোধিবৃক্ষের নীচে ধ্যান করতে করতে তাঁর জ্ঞানলাভ হয়েছিল।

প্র. ৩ টীকা লেখো।

১. আর্যসত্য ২. ভগবদ্গীতা

৩. পঞ্চশীল তত্ত্ব ৪. ত্রিরত্ন

প্র. ৪ নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

১. বিভিন্ন ধর্মের অহিংসা, করুণা ও সত্যের মতো মূল্যবোধের সমাজের উপর কী প্রভাব পড়ে?

২. যেকোনো দুটি ভিন্ন ধর্মের শিক্ষায় যে মিল আছে তা উদাহরণসহ বলো।

প্র. ৫ প্রার্থনা/ধ্যান-ধারণা, বিপাসনা (বিশেষ ধ্যান পদ্ধতি) থেকে মানবসমাজের কী কী সুবিধা হয়?

কৃতিকাজ

- বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের তথ্য একসাথে সংগ্রহ করো।
- 'সর্বধর্মসমভাব' বিষয়ে দলগত আলোচনা করো।
- মানচিত্রে পাঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দেখাও। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্মীয় স্থান, স্তূপ, জন্মস্থান ইত্যাদি।

উপক্রম

১. নীচের খালি জায়গায় তোমার পছন্দের উৎসব ও প্রকৃতির সম্পর্ক দেখানো একটি ছবি আঁকো।

***

৬ জনপদ এবং মহাজনপদ

৬.১ জনপদ

৬.২ মহাজনপদ

৬.৩ গণরাজ্য

৬.৪ মগধ সাম্রাজ্যের উত্থান

জেনে নাও।

তোমাদের গ্রাম বা শহরের কাজকর্ম কার মাধ্যমে এবং কীভাবে পরিচালিত হয়, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

প্রাচীন ভারতে অনেক ছোটো ছোটো গ্রামবসতি ছিল, সেখানে মানুষ চাষাবাদ করত, ব্যবসা করত এবং একসাথে বাস করত। ধীরে ধীরে গ্রামবসতিগুলির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গ্রামবসতিগুলির দল তৈরি হল। এই ধরনের দলকে জনপদ নাম দেওয়া হল।

কালক্রমে জনপদগুলো ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উন্নত সামরিক বাহিনী, উর্বর কৃষিভূমি, সুদক্ষ প্রশাসন এবং সমৃদ্ধ বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে এই জনপদগুলোর সীমানা বিস্তৃত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে 'মহাজনপদ'-এ রূপ নেয়।

আলোচনা করো।

এত বড়ো রাজ্যগুলিতে কে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ?

জনপদ, মহাজনপদ এবং রাজ্যের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো কী ছিল ?

কিছু জনপদের বিস্তার কীভাবে হয়েছিল ?

এবার আমরা তৎকালীন সমাজজীবন এবং শাসনব্যবস্থার রূপ বুঝে নেব।

৬.১ জনপদ

সাধারণভাবে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ পর্যন্ত সময়কালকে উত্তর-বৈদিক যুগ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে মানুষ ধীরে ধীরে আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠল। কোনো কোনো জায়গায় তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠল। এই বসতিগুলি পরে জনপদ নামে পরিচিত হল। জনপদ মানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের দল সেখানে মানুষ একসাথে থেকে চাষাবাদ, পশুপালন এবং ছোটো আকারে ব্যবসা করত। এই জনগোষ্ঠী একই গোষ্ঠীর হওয়ায় তাদের গোষ্ঠীর নাম জনপদগুলিকে দেওয়া হত। জনপদের একজন প্রধান থাকতেন, কিন্তু সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমাজের প্রবীণদের পরামর্শ অনুযায়ী নেওয়া হত। জনপদের জনজীবনের পদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল। জনপদকে প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ বলে মনে করা হয় সেখানে জনগণের অংশগ্রহণ, সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

৬.২ মহাজনপদ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ কিছু জনপদ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামরিক শক্তি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই শক্তিশালী ও বিশাল রাজ্যগুলোই পরবর্তীকালে মহাজনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মহাজনপদে অনেক গ্রাম, নগর, বাণিজ্যপথ এবং সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সমাবেশ

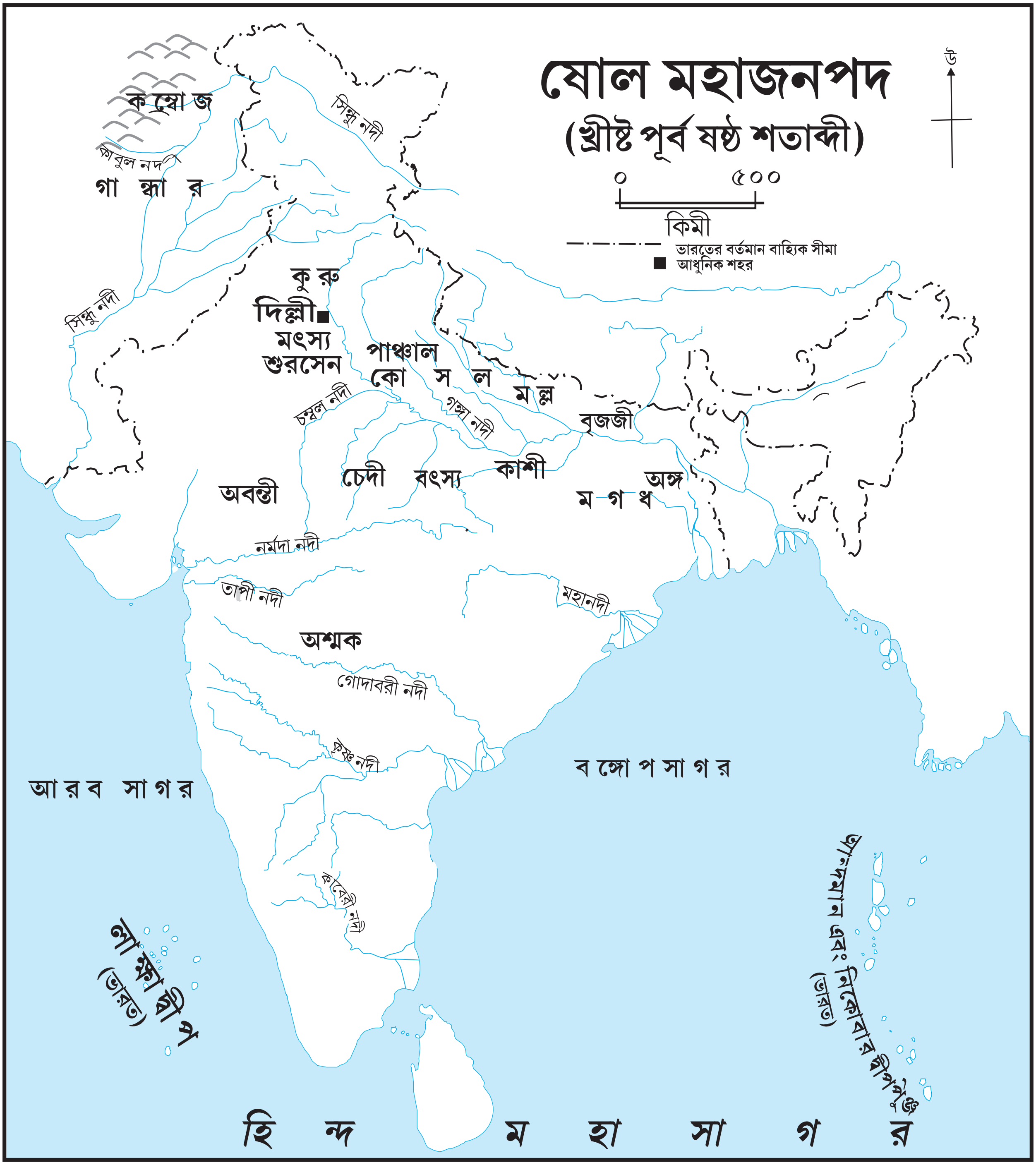

ছিল। মহাজনপদে রাজা বা পরামর্শদাতা মণ্ডল নেতৃত্ব দিত। এখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ছিল। মহাজনপদে কৃষি, বাণিজ্য, বাজার এবং শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল। কিছু মহাজনপদ তাদের সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে বিস্তার লাভ করে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত মহাজনপদগুলির মধ্যে ষোলোটি মহাজনপদ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল।

তাদের নামগুলি নিম্নরূপ -

মহাজনপদ ও তার রাজধানী :

১. কাশী - বারাণসী

২. কোশল - শ্রাবস্তী

৩. অঙ্গ - চম্পা

৪. মগধ - গিরিব্রজ/রাজগৃহ

৫. বৃজ্জি/বজ্জি - বৈশালী

৬. মল্ল/মালব - কুশিনার/কুশীনগর

৭. চেদি - শুক্তিমতী/সোত্থিবতী

৮. বংশবস - কৌশাম্বী

৯. কুরু - ইন্দ্রপ্রস্থ/ইন্দ্রপট্টণ

১০. উত্তর পাঞ্চাল - অহিচ্ছত্র, দক্ষিণ পাঞ্চাল - কাম্পিল্য

১১. মৎস্য - বিরাটনগর

১২. শূরসেন - মথুরা

১৩. অশ্মক/অস্সক - পোটলি/পোতন/পোদন

১৪. অবন্তী - উজ্জয়িনী এবং মহিস্মতী

১৫. গান্ধার - তক্ষশিলা

১৬. কম্বোজ - রাজপুর

প্রাচীন ভারতে বড় বড় রাজ্য গড়ে ওঠার আগের ধাপটিই ছিল মহাজনপদ। সেই সময়কার মোট ষোলোটি মহাজনপদের মধ্যে মগধ, কোশল, বৎস এবং অবন্তী - এই চারটি মহাজনপদ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। একটি জনপদের তুলনায় একটি মহাজনপদ এলাকা বা ভূখণ্ড, জনসংখ্যা এবং ধন-সম্পদের দিক থেকে অনেক বড় ছিল।

৬.৩ গণরাজ্য

কিছু মহাজনপদে প্রশাসন পদ্ধতিতে জনপদের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ থাকত, তাকে 'গণরাজ্য' (প্রজাতন্ত্র) বলে। গণরাজ্যে সব সিদ্ধান্ত একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না থেকে, জনপ্রতিনিধিদের বা পরামর্শদাতা মণ্ডলের সাহায্যে নেওয়া হত। এই মণ্ডলে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা, যোদ্ধারা বা নির্বাচিত মানুষেরা থাকতেন। জনপদের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে 'গণপরিষদ' গঠিত হত। গণপরিষদের সদস্যরা একসাথে আলোচনা করে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। সেই সংক্রান্ত আলোচনা যে সভাগৃহে হত, তাকে 'সন্থাগার' (সংধাগার) বলা হত। উদাহরণ স্বরূপ, বৃজ্জি সংঘ একটি গণরাজ্য ছিল, সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ থাকত। তেমনইভাবে মল্ল গণরাজ্যেও সমষ্টিগত নেতৃত্বের পদ্ধতি ছিল। এই গণরাজ্যগুলির কারণে প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল বলা যায়। গণরাজ্য মহাজনপদের বিভিন্ন রূপের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, কারণ প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র এবং জনগণের অংশগ্রহণ উভয় পদ্ধতিই কার্যকর ছিল তা এর মাধ্যমে বোঝা যায়। এই ব্যবস্থার কারণে রাজ্যশাসনে স্থিতিশীলতা এবং জনগণের ভূমিকা নিশ্চিত হয়েছিল।

জেনে নাও।

গণপরিষদের ভোটদান পদ্ধতি - সভাগৃহে কোনো বিষয় সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদিত হত। ভোটদানের ধরন ছিল প্রকাশ্য ভোটদান, কণ্ঠভোট বা গোপন পদ্ধতিতে ভোটদান। সদস্যের মতকে 'ছন্দ' বলা হত। বিভিন্ন রঙের 'দণ্ডিকা' ভোটপত্র হিসেবে ব্যবহার করা হত, তাকে 'শলাকা' বলত। ভোটদান কর্মকর্তাকে 'শলাকা গ্রাহক' বলা হত। অনুপস্থিত সদস্যদেরও ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে সাধারণত উপস্থিত সদস্যদের ভোটের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হত।

ভেবে দেখো।

গণরাজ্যের ভোটদান পদ্ধতি এবং বর্তমানের ভোটদান পদ্ধতির তুলনা করো।

৬.৪ মগধ রাজ্যের উত্থান

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাজনপদগুলির মধ্যে মগধ সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মহাজনপদ হিসেবে উদয় হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মগধ রাজ্যের উত্থানের পিছনে কিছু প্রধান কারণ ছিল –

ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা

- গঙ্গা নদীর তীরে উর্বর জমি
- নদীপথের মাধ্যমে বাণিজ্য

খনিজ সম্পদ

- বিশেষ করে লোহার বিশাল প্রকৃতিক ভাণ্ডার
- উন্নত চাষের কৌশল জানা
- উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার করতে থাকলো

শক্তিশালী নেতৃত্ব

- বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর মতো রাজারা রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।
- পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপনা করা হয়েছিল কারণ এটি সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। পাটলিপুত্র থেকে সমগ্র মগধ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল
- প্রশাসকীয় সুবিধার জন্য রাজ্য অনেক সংগঠিত হয়েছিল

মজবুত অর্থনীতি

- বাণিজ্য এবং বাজারের বিকাশ
- গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল, যেখান থেকে অন্যান্য দেশে বস্ত্র, মসলা, ধাতু এবং অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি হতো

রাজনৈতিক জোট

- অন্যান্য মহাজনপদের সমাবিষ্ট করেছিল।
- রাজ্য বিস্তারের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল

জনপদ ও মহাজনপদের রাজনৈতিক এবং আর্থিক বিকাশের ফলাফল মগধ রাজ্যের শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠনে দেখা যায়। এটিকে প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম উদাহরণ বলে মনে করা হয়।

বিম্বিসার রাজা মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আমলে মগধের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। তিনি রাজগৃহে মগধের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বিম্বিসারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু ক্ষমতায় এলেন। তিনিও মগধের বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অজাতশত্রু বৃজ্জি গণরাজ্য এবং কোশল রাজ্য জয় করেছিলেন।

তোমরা জানো কী ?

কিছু নতুন অস্ত্র তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি মহাশিলাকণ্টক নামের একটি বড়ো

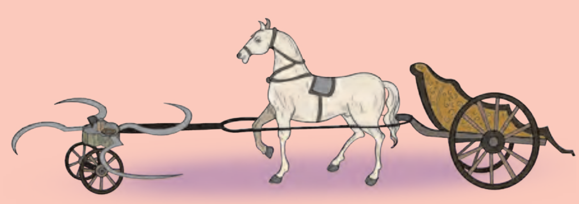

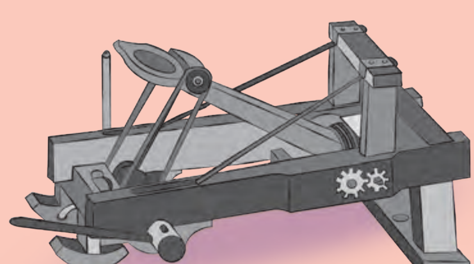

পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যার সাহায্যে শত্রুর দুর্গের দেয়াল সহজেই ভেঙে পড়ত। এ ছাড়া রথমুসল নামের কাঁটাযুক্ত লোহার দণ্ডবিশিষ্ট একটি বিশেষ রথ তৈরি করেছিলেন, যা শত্রুর পদাতিক বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বড়ো ক্ষতি করা যেত। এই নতুন অস্ত্রশস্ত্র অজাতশত্রুকে বৃজ্জির মতো শক্তিশালী গণরাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নির্ণায়ক জয় পেতে সাহায্য করেছিল এবং মগধের শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকল।

অজাতশত্রু বিহারের পাটলিপুত্রে (আজকের পাটনা শহর) নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

বলো তো দেখি!

রাজধানীর কী মহত্ব আছে? রাজধানী কোথায় হওয়া উচিত তার কী কী মানদণ্ড থাকে। এই বিষয়ে শিক্ষকের সাহায্যে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

অজাতশত্রু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের অনুগামী হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর অজাতশত্রুর শাসনকালে রাজ গৃহে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম সংগীতি (পরিষদ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অজাতশত্রুর পরবর্তী মগধের রাজাদের মধ্যে শিশুনাগ একজন গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন। তিনি অবন্তী, বস এবং কোশল রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন, তার ফলে মগধের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শিশুনাগের পরে নন্দ বংশের উদ্ভব হল। মহাপদ্মনন্দ ছিলেন নন্দ বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা। তিনি মগধ সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তার করে ছিলেন। উত্তর ভারতের অনেক ছোটো রাজ্য তিনি নিজের অধীনে এনেছিলেন। নন্দ রাজারা তাদের বিশাল সেনাদলের জন্য, সম্পদের জন্য এবং কর ব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাদের আমলে মগধ ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু শেষ রাজা ধনানন্দ ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী। তিনি অনেক কঠোর কর চাপানোর ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রশাসনব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তাঁর আমলে মগধ সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করেছিল। শেষপর্যন্ত আচার্য চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ রাজত্বের অবসান ঘটালেন এবং মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

জনপদ থেকে সাম্রাজ্য পর্যন্ত যাত্রা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। গ্রামবসতি থেকে শুরু হয়ে কীভাবে বড়ো রাজ্যে রূপান্তর ঘটল এবং গণরাজ্যগুলি কীভাবে বিকশিত হল, তা আমরা দেখতে পাই।

অজাতশত্রু - শিল্প

অনুশীলনী

প্র. ১ ক) সঠিক বিকল্পের সামনে ☑ চিহ্ন দাও।

১. গ্রামবসতিগুলির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গ্রামবসতিগুলির দল তৈরি হয়েছিল, সেই দলকে কী বলে ?

অ) জনপদ ☐

ব) মহাজনপদ ☐

ক) রাজ্য ☐

২. মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কে স্থাপন করেছিলেন ?

অ) শিশুনাগ ☐

ব) অজাতশত্রু ☐

ক) বিম্বিসার ☐

৩. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন ?

অ) শিশুনাগ ☐

ব) নন্দ ☐

ক) মৌর্য ☐

খ) জোড়া মেলাও।

‘ক’ দল	‘খ’ দল
১. ভোটদান প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী ব্যক্তি	অ)বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ
	ব)শলাকাগ্রাহক
২. বৃজ্জি	ক)মহাজনপদ
৩. অজাতশত্রু	ঘ)জনপদ

প্র. ২ একটি শব্দে উত্তর লেখো।

১. নন্দ বংশের শেষ রাজা -

২. বড়ো পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র -

৩. পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপনকারী -

প্র. ৩ ক) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

১.গ্রাম ও বসতি কীভাবে গড়ে উঠছিল ?

২. জনপদ কীভাবে তৈরি হয়েছিল ?

৩. মহাজনপদের বিকাশের কারণগুলি বলো।

প্র. ৩ খ) নিজের ভাষায় লেখো।

১. মগধ সাম্রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করতে অজাতশত্রু কী কী সংস্কার করেছিলেন ?

২. গণপরিষদের ভোটদান পদ্ধতি ও বর্তমান ভোটদান পদ্ধতির মধ্যে কিছু মিল ও পার্থক্য বলো।

প্র. ৪ পাঠের মানচিত্রটি দেখো এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

১. ভারতের বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানার বাইরে অবস্থিত মহাজনপদগুলির নাম লেখো।

২. ‘অশ্মক’ মহাজনপদটি বর্তমানে কোন রাজ্যে পড়ে ?

৩. মহাজনপদগুলি বেশিরভাগ কোন নদীর উপকূলে অবস্থিত ?

উপক্রম

পাঠে উল্লিখিত মহাজনপদগুলি বর্তমানে ভারতের কোন কোন রাজ্যে পড়ে, ইন্টারনেটের সাহায্যে তা খুঁজে বের করো এবং মহাজনপদ ও রাজ্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

উদাহরণ: অবন্তী : গুজরাত

***

৭ মৌর্যকালীন ভারত

৭.১ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

৭.২ সম্রাট অশোক

৭.৩ মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

৭.৪ কলা, স্থাপত্য ও জনজীবন

'যুগপ্রবর্তন' মানে হলো কালের পরিবর্তন সমাজে চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের নতুন প্রবাহ তৈরি হওয়া। যখন কোনো ব্যক্তির কাজ বা চিন্তা সমাজকে নতুন দিক দেখায়, তখন তাঁকে 'যুগপ্রবর্তক' বলা হয়।

এমনই এক যুগপ্রবর্তক কালের সূচনা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সেই সময়ে ভারত অনেক ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বিদেশি আক্রমণ বাড়ছিল এবং সেই একই সময়ে মগধ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে এক গুরু তাঁর বুদ্ধি, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও নীতি দিয়ে তাঁর তরুণ শিষ্যকে গড়ে তুললেন। সেই গুরুর নাম ছিল আচার্য চাণক্য এবং শিষ্যের নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। এই দুজনের মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। সম্রাট অশোক ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের আরেকজন যুগপ্রবর্তক রাজা। সম্রাট অশোক গৌতম বুদ্ধের শান্তির বাণী ভারতের বাইরেও অনেক দূরে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ভেবে দেখো।

- ভারতের প্রথম বৃহৎ ও সংগঠিত সাম্রাজ্য কীভাবে গড়ে উঠেছিল ?
- সম্রাট অশোক তাঁর সাম্রাজ্যে জায়গায় জায়গায় স্তম্ভলেখ স্থাপন করেছিলেন কেন ?

চলো, আমরা সময়ের পাতা উল্টাই এবং সেই যুগে ফিরে গিয়ে এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি !

৭.১ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

আগের পাঠে আমরা দেখেছি যে মগধ সাম্রাজ্যে নন্দ বংশের রাজা ধনানন্দ রাজত্ব করতেন। তিনি অত্যন্ত ধনী হলেও প্রজাদের মনে তাঁর প্রতি অসন্তোষ ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ধনানন্দকে পরাজিত করলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধ জয় করলেন। তিনি অবন্তী ও সৌরাষ্ট্র জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে শুরু করলেন।

তোমরা জানো কী ?

আচার্য চাণক্যকে 'কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত' নামেও ডাকা হয়। তিনি একজন মহান রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন। চাণক্য 'অর্থশাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে শাসনব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, গুপ্তচর ও রাজনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত যখন ছোটো ছিলেন, তখন তিনি বন্ধুদের সাথে খেলতেন। সেই খেলায় রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতেন চন্দ্রগুপ্ত। তিনি ও তাঁর বন্ধুরা কোনো গাছের নীচে বা খোলা জায়গায় তাদের 'দরবার' বসাতেন।

একদিন আচার্য চাণক্য সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে এই খেলা খেলতে দেখলেন। চন্দ্রগুপ্তের স্বাভাবিক নেতৃত্বগুণ ও বিচার করার ধরন

দেখে চাণক্য তাঁর মধ্যে সম্ভাবনা চিনে নিলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে এই ছেলেই নন্দ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে একটি বিশাল ও উপযুক্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

এরপর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন, তাঁকে শিক্ষা দিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যা ও শাসনকার্যে দক্ষ করে তুললেন। চন্দ্রগুপ্ত পরবর্তীকালে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ভারতে ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গড়ে তুললেন। বিশাখাদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে নন্দ বংশের শেষ রাজা ধনানন্দের জায়গায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনিতে চাণক্যের অবদানের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।

করে দেখো।

গ্রন্থাগারের বই অথবা ইন্টারনেটের শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত গল্প খুঁজে বের করো। শ্রেণীতে দল তৈরি করে সেই গল্পগুলো নাটকের আকারে উপস্থাপন করো।

গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার (সিকান্দার) খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আক্রমণ করেন। তিনি ভারতের পঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন। তিনি মধ্যদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ফেরার পথেই সিকান্দারের মৃত্যু হয়। ভারতে জয় করা অঞ্চলগুলোর শাসনের জন্য তিনি কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের 'স্যাট্রাপ' বলা হতো। তাঁর মৃত্যুর পর স্যাট্রাপদের মধ্যে ক্ষমতার দখলে যুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়েই গ্রিক সেনাপতি সেলুকাস নিকেটর ভারত আক্রমণের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পরাজিত করলেন। এর ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং ভারতে গ্রিক শাসনের প্রভাব আর বাড়তে পারল না। আফগানিস্তানের কাবুল, কান্দাহার, হেরাত এই অঞ্চলগুলো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। মেগাস্থিনিস ছিলেন সেলুকাস নিকেটরের দূত, যিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে ছিলেন। তাঁর রচিত 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের বিবরণ মৌর্যকালীন ভারত অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

তোমরা জানো কী ?

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে বর্তমান গুজরাত রাজ্যের জুনাগড়ে 'সুদর্শন' নামে একটি জলাশয় নির্মাণ করা হয়েছিল। কৃষি, সেচ ও পানীয় জলের সরবরাহের জন্য এই জলাশয়টি কাজে আসত। জলব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশাসনে বিশেষ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হতো। চাণক্য রচিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে জলাশয়ের ক্ষতি করলে সেই ব্যক্তিকে কী শাস্তি দেওয়া হবে তা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সুশৃঙ্খল কর ব্যবস্থা ও জলাশয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ফলে মৌর্য যুগে দক্ষ জলব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালেও অনেক রাজা এই জলাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। সম্রাট অশোক, শক রাজা রুদ্রদামন এবং পরবর্তীকালের রাজারাও সুদর্শন জলাশয়ের সংস্কার করেছিলেন। এর উল্লেখ জুনাগড়ের শিলালেখে পাওয়া যায়।

সুদর্শন জলাশয় প্রাচীন ভারতীয় জলব্যবস্থাপনা ও প্রকৌশল দক্ষতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

তোমার মত কী ?

প্রাচীনকালের জলব্যবস্থাপনার জ্ঞান কি আধুনিক যুগেও কাজে লাগবে ?

চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজত্বের শেষে সিংহাসন ত্যাগ করে জৈন ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি কর্নাটকের শ্রবণবেলগোলায় বসবাস করলেন। চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার ক্ষমতায় এলেন। বিন্দুসার সাম্রাজ্যের বিস্তার চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি ইন্দো-গ্রিক স্যাট্রাপদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তাঁর শাসনকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও মজবুত হলো। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক ক্ষমতায় এলেন।

মৌর্যকালীন ভারত
উ.
▲ অশোকের শিলালিপি
অশোকের স্তম্ভলেখ
অশোকের সাম্রাজ্য
ভারতের বর্তমান আন্তররাষ্ট্রীয় সীমা
■ আধুনিক শহর
হিন্দুকুশ পর্বত
শহবাজ গড়ী
মনসেরা
কাবুল নদী
তক্ষশিলা
আফগানিস্তান
সিন্ধু নদী
চীন
তোপ্রা
কালসী
মীরত
দিল্লী
(ইন্দ্রপ্রস্থ)
যমুনা নদী
বৈরাট
মথুরা
চম্বল নদী
গঙ্গা নদী
শ্রাবস্তী
নিগলীবা
কপিলবস্তু
রুম্মিনদেই
ললিত পাটন
রামপূর্বা
লৌরিয়া নন্দনগড়
লৌরিয়া অররাজ
পাটলি পুত্র
প্রয়াগ
কাশী
সহস্রাম
মগধ
চম্পা
বাংলাদেশ
ম্যানমার
ব্রহ্মপুত্র
কচ্ছ
উজ্জৈন
রূপনাথ
সাঞ্চী
নর্মদা নদী
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
তাম্রলিপ্ত
তাপী নদী
মহানদী
তোশালী
জৌগড়
সোপারা
গোদাবরী নদী
কলিঙ্গ
সন্নতী
আন্ধ্র
কৃষ্ণা নদী
মস্কী
কৃপগল
সুবর্ণগিরী
সিদ্ধাপুর
ব্রহ্মগিরী
নেল্লোর
কাবেরী নদী
চোল
পান্ড্য
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
লাক্ষাদ্বীপ
(ভারত)
আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(ভারত)
০
৫০০ কিলোমিটার
শ্রীলঙ্কা
হিন্দ মহাসাগর

৭.২ সম্রাট অশোক

সম্রাট অশোক

বিন্দুসার তাঁর রাজত্বকালে উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলায় অশোককে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানে তিনি শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। পরাক্রম, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার গুণে তিনি ক্ষমতায় এলেন। উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে উত্তরে নেপাল পর্যন্ত, দক্ষিণে কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত, পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ অভিযান

সম্রাট অশোকের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো কলিঙ্গ যুদ্ধ। প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য আজকের ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যটি মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না। তাই অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করলেন এবং তাতে তিনি জয়ী হলেন। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈনিক নিহত হলো, অনেকে বন্দি হলো। এত প্রচণ্ড ক্ষতিতে অশোকের মনে গভীর অনুশোচনা জাগল। এই যুদ্ধ সম্রাট অশোকের সমগ্র জীবনকেই বদলে দিল!

ভেবে দেখো।

কল্পনা করো, তুমি একজন সাংবাদিক। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোকের জীবনে কোন ধরণের পরিবর্তন এসেছিল, এবিষয়ে তুমি ওনার সাক্ষাৎকার নেবার সময় কোন ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে?

সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচারের কাজ

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন। দৈনন্দিন জীবনে অহিংসার আচরণ, মা-বাবার সেবা-শুশ্রূষা, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এই নীতিগুলোর উপর তিনি জোর দিলেন। এছাড়া তিনি দান করা, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া এবং ক্রোধ, কঠোরতা, অহংকার, ঈর্ষা প্রভৃতি দুর্গুণ থেকে দূরে থাকার মতো সদাচারের নীতিমালার প্রচার করলেন। সম্রাট অশোক তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জায়গায় জায়গায় শিলালেখ ও স্তম্ভলেখ খোদাই করালেন। এই লেখগুলো ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। এই লেখগুলোতে তিনি নিজেকে 'দেবানং পিয়ো পিয়দসী' অর্থাৎ 'দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী' বলে উল্লেখ করেছেন। এ রকম আবিষ্কৃত প্রায় ৩৫টি শিলালেখ অশোককালীন ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। এই শিলালেখগুলোতে তিনি অহিংসা, প্রাণিদয়া, পরোপকার, ধর্মসহিষ্ণুতা, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি সদ্গুণ প্রজারা যেন পালন করে সেই আহ্বান জানিয়েছেন। এই লক্ষ্যে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে **ধম্ম কর্মকর্তা** নিযুক্ত করলেন। তাঁদের **'ধম্মমহামন্ত'** বলা হতো। এই কর্মকর্তারা মানুষের মধ্যে নৈতিকতার বার্তা পৌঁছে দিতেন। এই নীতিগুলোর প্রচারের জন্য অশোক বিদেশেও ধর্মপ্রচারক পাঠালেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে শ্রীলঙ্কায় ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া পশ্চিমে সিরিয়া, মিশর, গ্রিস এবং পূর্বে মিয়ানমার-সহ আরও অনেক দেশে অশোক ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। অশোক পাটলিপুত্রে বৌদ্ধ ধর্মসভা আহ্বান করেছিলেন।

সম্রাট অশোকের জনকল্যাণমূলক কাজ

সম্রাট অশোক ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রজাবৎসল শাসক। অশোক তাঁর প্রজাদের জন্য অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। তিনি চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও ধর্মশালা নির্মাণ করলেন। নগরে ও রাস্তার দুপাশে গাছ লাগালেন। কুয়ো ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করলেন। তিনি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় তৈরি করলেন। অশোকের শিলালেখগুলোতে প্রজাদের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

ভেবে দেখো।

একজন জনকল্যাণকামী শাসকের কী কী গুণ থাকা উচিত এবং তিনি কোন কোন কাজকে অগ্রাধিকার দেবেন - এই বিষয়ে শ্রেণীতে আলোচনা করো।

৭.৩ মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

মৌর্যকালীন শাসনব্যবস্থায় রাজার হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল। তাঁর হাতে কার্যকরী, বৈচারিক, সামরিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা একত্রিত ছিল। রাজাকে ধর্ম, ন্যায় ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য দায়িত্বশীল মনে করা হতো।

রাজাকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশাল মন্ত্রিপরিষদ ছিল। তাতে কর ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, গুপ্তচর বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভাগের প্রধানরা ছিলেন। তাঁদের 'অধ্যক্ষ' বলা হতো। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'পণ্যাধ্যক্ষ' (বাণিজ্যের প্রধান কর্মকর্তা) ও 'সীতাধ্যক্ষ' (কৃষির প্রধান কর্মকর্তা)।

মৌর্যকালে গুপ্তচর বিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। গুপ্তচররা রাজাকে সাম্রাজ্যের গতিবিধি, প্রশাসনের খবর ও শত্রুদের তথ্য সরবরাহ করত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই গুপ্তচর ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অর্থব্যবস্থা ও কর ব্যবস্থার রূপও নির্দিষ্ট করা ছিল। কৃষি, বাণিজ্য, খনিজ আহরণ ও হস্তশিল্পের উপর কর আরোপ করা হতো। জনকল্যাণ, প্রতিরক্ষা ও ধর্মকার্যের জন্য রাজকোষ থেকে ব্যয় করা হতো।

শাসনের সুবিধার জন্য রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল –

বিভাগ	রাজধানী
পূর্ব	তোশালি
পশ্চিম	উজ্জয়িনী
দক্ষিণ	সুবর্ণগিরি
উত্তর	তক্ষশীলা

শাসন তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত ছিল –

কেন্দ্রীয় শাসন - রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে সাম্রাজ্যের সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। রাজা, মন্ত্রিপরিষদ ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাহায্যে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন কার্যকরভাবে পরিচালিত হতো।

প্রাদেশিক শাসন - সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশ কুমার (রাজ পুত্র) ও মহামাত্য (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)-র সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হতো।

স্থানীয় শাসন - গ্রাম ও নগরের স্তরে গ্রামণী (গ্রামের মুখ্য), নগর ও স্থানীয় সমিতির মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যপরিচালনা, কর, বিচার ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা করা হতো।

তোমরা জানো কী ?

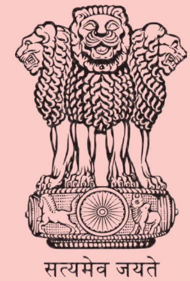

ভারতের জাতীয় পতাকায় অশোকচক্র ও রাজমুদ্রা দেখেছ? এই প্রতীকগুলো সম্পর্কে তোমাদের কী জানা আছে? এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করো এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

৭.৪ শিল্প, স্থাপত্য ও লোকজীবন

মৌর্যকালীন শিল্পকলা অত্যন্ত উন্নত ছিল। সম্রাট অশোকের আদেশে নির্মিত স্তম্ভ ও স্তূপ তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মৌর্যকালীন ভাস্কর্যে সিংহ, হাতি, ষাঁড় প্রভৃতি প্রাণী স্থান পেয়েছিল। প্রাণী ও মানুষের সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক রূপায়ণ করা হয়েছিল।

অশোক স্তম্ভ

অনেক বিদেশি পর্যটকের বিবরণে রাজধানী পাটলিপুত্রের বিশাল রাজপ্রাসাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মীয় স্থাপত্যে স্তূপ ও বিহারের গুরুত্ব ছিল। এই যুগে খোদাই করা বিহারের বরাবর গুহাগুলো সবচেয়ে প্রাচীন গুহা। সাঁচিস্তূপ ও সারনাথ স্তূপ এই যুগের স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বরাবর গুহা

মৌর্যকালে পাথরকে বিশেষ কৌশলে এতটাই মসৃণ ও চকচকে করে ঘষা হতো যে তাতে আয়নার মতো প্রতিফলন দেখা যেত। অশোকের স্তম্ভে, গুহাগুলোতে ও কিছু ভাস্কর্যে দেখা যাওয়া এই কৌশল প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের সর্বোচ্চ দক্ষতার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। বিনোদনের অনেক রকম ধরন ও মাধ্যম তৈরি হয়েছিল। নৃত্য, নাটক, গান এই অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করা হতো। রথ ও ঘোড়দৌড়, মল্লযুদ্ধ, নৃত্যসংগীত প্রতিযোগিতা ছিল জনপ্রিয় বিনোদন। পাশার খেলা ও দাবার মতো খেলাগুলো সানন্দে খেলা হতো।

করে দেখো।

মৌর্যকালীন স্তম্ভ, শিলালেখ ও ভাস্কর্যের ছবি সংগ্রহ করো এবং খাতায় সেঁটে রাখো।

মৌর্যকালে লোকজীবন সমৃদ্ধ ও সুখী ছিল। কৃষি উৎপাদনের গুরুত্ব ছিল। দুধ, দই, ঘি, নানা রকম ফল, চাল, যব প্রভৃতি খাবারে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তোমরা জানো কী ?

মৌর্যকালীন লোকজীবন সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস বলেন, 'এখানকার মানুষ পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী। তারা অনেক শিল্পকলায় দক্ষ। কৃষকরা বছরে দুটো ফসল ওঠান। যুদ্ধ চলাকালীনও কেউ কৃষকদের কষ্ট দেয় না। শত্রুপক্ষও ফসল নষ্ট করে না। মানুষ সুখী ও সৎ। চুরি প্রায় হয় না বললেই চলে। মানুষ আদালতে খুব কম যায়। কেউ কারো দাস হতে পারে না।'

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের অগ্রগতির একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর অবশ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। স্থানীয় শাসকরা স্বাধীন হতে শুরু করলেন এবং সাম্রাজ্য টুকরো হয়ে গেল। মৌর্য সাম্রাজ্যের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ - ইনি শুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন।

অনুশীলনী

প্র.১ ক) সঠিক বিকল্পের সামনে ☑ চিহ্ন দাও।

১. 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের কাহিনির বিষয়বস্তু
   - ক) গুপ্তচর ব্যবস্থার বিবরণ ☐
   - খ) নন্দ বংশের পতন ও চন্দ্রগুপ্তের কার্য ☐
   - গ) মৌর্যকালীন লোকজীবন ☐

২. মেগাস্থেনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে নিম্ন লিখিত বিষয়টির বর্ণনা করা হয়েছে।
   - ক) সর্বত্র উত্তম আচরণ ☐
   - খ) কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণ ☐
   - গ) শাসনব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, গুপ্তচর ও রাজনীতি ☐

৩. মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়টির বর্ণনা করা হয়েছে।
   - ক) জলাশয়ের ক্ষতি করলে সেই ব্যক্তিকে কী শাস্তি দেওয়া হবে তার নির্দেশনা ☐
   - খ) অহিংসা, প্রাণিদয়া, পরোপকার, ধর্মসহিষ্ণুতা, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি সদ্গুণ প্রজারা যেন পালন করে। ☐
   - গ) এখানকার মানুষ পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী। তারা অনেক শিল্পকলায় দক্ষ। ভারতীয়দের ঐতিহ্য মহান। ☐

খ) নামগুলো লেখো।

১. নন্দ বংশের শেষ রাজা ....

২. 'দেবানং পিয়ো পিয়দসী' ....

৩. মেগাস্থিনিস রচিত গ্রন্থ ....

প্র. ২ ধারণাচিত্র সম্পূর্ণ করো।

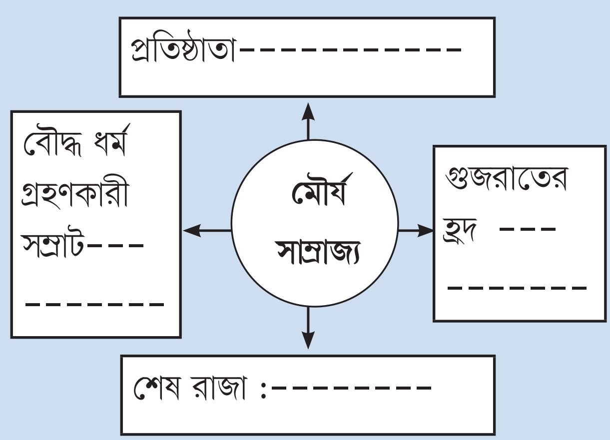

খ) ঘটনাগুলো কালানুক্রমিক সাজাও।

১. সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

২. কলিঙ্গ যুদ্ধে সম্রাট অশোক জয়ী হলেন।

৩. উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলায় অশোককে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হলো।

৪. পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হলো।

প্র.৩ ক) সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখো।

১. সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচারের কাজ।

২. মৌর্যকালীন ভাস্কর্যশিল্প।

খ) নীচের ঘটনাগুলো কেন ঘটেছিল? কারণ খোঁজো।

১. সম্রাট অশোক হিংসার পথ ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

২. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধনানন্দকে পরাজিত করলেন।

প্র.৪ নীচের প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত উত্তর লেখো।

১. সম্রাট অশোক তাঁর শিলালেখগুলোতে জনসাধারণের জন্য কী কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

২. সুদর্শন জলাশয় প্রাচীন ভারতীয় জলব্যবস্থাপনা ও প্রকৌশল দক্ষতার প্রতীক কেন বিবেচিত হয়?

৩. বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর সম্রাট অশোক নিজের মধ্যে কী পরিবর্তন আনলেন?

উপক্রম

১. 'আমি চাণক্য বলছি...' এই একক অভিনয়ের মাধ্যমে মৌর্য সাম্রাজ্যের পরিচয় প্রার্থনাসভায় উপস্থাপন করো।

২. তোমাদের এলাকার জলব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির জল সংগ্রহ (রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং) ও 'হর ঘর জল' প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো এবং সেই বিষয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করো।

***

৮ প্রাচীন ভারত ও মহারাষ্ট্রের রাজ্য ও রাজবংশ

৮.১.শুঙ্গ বংশ

৮.২.কণ্ব বংশ

৮.৩.ইন্দো-গ্রিক(যবন)শাসকবর্গ

৮.৪.শক শাসকবর্গ

৮.৫.সাতবাহন বংশ

৮.৬.কুশাণ শাসকবর্গ

৮.৭.গুপ্ত বংশ

৮.৮.বর্ধন বংশ

'ভারতের মানচিত্র যদি কথা বলতে শুরু করে ?'

কল্পনা করো, ভারতের মানচিত্র তোমাদের সঙ্গে কথা বলছে !

মানচিত্র বলছে :

''প্রাচীন কালে আমার অভ্যন্তরীণ সীমানার মধ্যে অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে। কিছু শাসক এসেছিলেন সাত সমুদ্রের পার থেকে আর কিছু ছিলেন এখানকারই স্থানীয় মানুষ।''

''সম্রাট অশোকের পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল এবং শেষপর্যন্ত সেটি লুপ্ত হয়ে ভারতবর্ষে অনেক ছোটবড় রাজশক্তির উদয় ঘটল। মৌর্যদের পরে শুঙ্গ ও কণ্ব বংশ নিজেদের রাজ্য স্থাপন করল। এই সময়েই আমাদের দেশে গ্রিক (যবন), শক, কুশাণ - এই বিদেশি শক্তিগুলির আক্রমণ ঘটতে থাকল। কিছুকালের জন্য তারা এখানে রাজ্য স্থাপন করল। এই একই কালে দক্ষিণে সাতবাহন বংশের উদয় হল। তারপর বাকাটক এবং উত্তরে গুপ্ত বংশের রাজ্য স্থাপিত হল। গুপ্ত রাজ্যের অবসানের পরে বর্ধন বংশ বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠল।''

মানচিত্র তোমাদের জিজ্ঞেস করছে :

- **মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে তোমরা কোন-কোন বিষয় বুঝতে পারো ?**
- **ইতিহাস বুঝে নিতে আমার সাহায্য তোমরা কি ভাবে পাবে ?**
- **গুপ্ত সাম্রাজ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য ছিল। মহারাষ্ট্র এই সাম্রাজ্যের অংশ ছিল কি সেটা বলো ?**

ছাত্রছাত্রীরা, ভারতের মানচিত্রের সঙ্গে কিছু প্রাচীন সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সন্ধান করতে তোমরা কি একটি অসাধারণ যাত্রায় যেতে চাও ? তাহলে চলো !

৮.১. শুঙ্গ বংশ

সম্রাট অশোকের পরে মৌর্য সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে লাগল এবং সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল। এই অস্থির পরিস্থিতিতে মৌর্য সেনাবাহিনীর সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ক্ষমতা হস্তগত করলেন। পুষ্যমিত্র বৈদিক ধর্মের সমর্থক ছিলেন। তিনি বৈদিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। তাঁর রাজ্যের বিস্তার পাঞ্জাবে জলন্ধর ও শিয়ালকোট (শাকল) পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায়।

৮.২. কণ্ব বংশ

দেবভূতি শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা। তাঁর পরে শুঙ্গ বংশের অবসান ঘটল এবং কণ্ব বংশ প্রতিষ্ঠিত হল। কণ্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বসুদেব কণ্ব। কণ্ব বংশের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ীত্ব হয়নি। তবু উত্তর ভারতে তাদের শাসন বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়েছিল। তাঁরা কলা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে উৎসাহিত করলেন।

৮.৩. ইন্দো-গ্রিক (যবন) শাসকবর্গ

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরে তাঁর সেনাবাহিনীর অনেক গ্রিক সেনাধিকারি ও শাসক ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। পরে তাঁরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। তাঁদের 'ইন্দো-গ্রিক' বা যবন নামে চেনা যায়।

তোমরা জানো কী ?

প্রাচীন ভারতে 'যবন' শব্দটি গ্রিক মানুষদের জন্য ব্যবহার করা হত। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'আইওনিয়ান' নামক মূল গ্রিক শব্দ থেকে। গ্রিসের আইওনিয়া অঞ্চলে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের ভারতে 'যবন' বলা হত। পরে বিদেশ থেকে আসা সকলকেই 'যবন' বলা হতে লাগল।

আফগানিস্তান, পাঞ্জাব ও গান্ধার অঞ্চলে ইন্দো-গ্রিকরা শক্তিশালী শাসনের ভিত্তি গড়ে তুললেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় রাজা হলেন মিনেন্দার, যাঁকে মিলিন্দ নামে ডাকা হয়। মিনেন্দার একজন পণ্ডিত, বিচারশীল ও প্রজা-বৎসল শাসক হিসেবে পরিচিত। মিনেন্দার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে ঘটা প্রশ্নোত্তর-আকারের সংলাপ 'মিলিন্দপঞ্হ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাতে বৌদ্ধ ধর্মের দর্শনের বিবরণ রয়েছে।

ইন্দো-গ্রিক রাজাদের মুদ্রায় গ্রিক ও খরোষ্ঠী এই দুটি লিপিতে লেখ পাওয়া যায়। মুদ্রার একপিঠে রাজার মুখমণ্ডল, তাঁর শিরস্ত্রাণ এবং অন্য পিঠে কোনো দেবতার প্রতিমা খোদাই করা থাকত। তাঁদের শাসনকালে বাণিজ্য, বিশেষত পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্রপথ ও স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেল।

ইন্দো-গ্রীক মুদ্রাকে : একপিঠ এবং অন্য পিঠে

তোমরা জানো কী ?

গান্ধার শৈলী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই শৈলীতে গ্রিক শৈলীর প্রভাব দেখা যায়। এই শিল্পকলার ধারাটির বিকাশ মূলত কুশাণদের আমলে হয়েছিল। আধুনিক পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও

উত্তর-পশ্চিম ভারত ছিল এই শিল্পকলার ধারার প্রধান কেন্দ্র। গান্ধার শৈলীতে মানবাকৃতি অত্যন্ত জীবন্তও সুষম দেখায়। গান্ধার শৈলীতে প্রথমবারের মতো গৌতম বুদ্ধের প্রতিমা তৈরি হতে দেখা যায়।

৮.৪. শক শাসকবর্গ

মৌর্যোত্তর কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথ দিয়ে অনেক বিদেশি ভারতে প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একটি দল হল শক। তাদের 'স্কিথিয়ান' নামেও বলা হয়। শকস্তান বা শীস্তান প্রাচীন কালে শকদের মূল অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চল থেকে আসা মানুষদের গ্রিক ও রোমান ঐতিহ্যে স্কিথিয়ান বলা হত। শকস্তান বর্তমান ইরান, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। মধ্য এশিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তারা পশ্চিম ভারতের গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মালব অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল। প্রথম রুদ্রদামন

ছিলেন ভারতের শক শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও শক্তিশালী শাসক। তাঁর আমলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল এবং সমাজব্যবস্থা আরও স্থিতিশীল হল।

জুনাগড়ের শিলালিপি

রুদ্রদামনের জুনাগড়ের শিলালিপি বিখ্যাত। এই শিলালিপি সম্পর্কে তোমরা আগের পাঠে জেনেছিলে। এই শিলালিপিতে তাঁর শাসনব্যবস্থা, প্রজার কল্যাণের জন্য করা কাজ এবং যুদ্ধে পরাক্রমের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

শকদের আমলে সমুদ্রপথে বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শকরা বন্দর উন্নত করল, ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা দিল এবং রাজার টাঁকশালে তৈরি মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলন করল। এই মুদ্রাগুলি প্রধানত রুপোর হত এবং সেগুলিতে ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা পাওয়া যায়। তাই ভারতীয় মুদ্রাবিদ্যা (নাণকশাস্ত্র) অধ্যয়ন করতে গেলে শকদের মুদ্রা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই মুদ্রাগুলিতে শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

তোমরা জানো কী ?

'শকাব্দ' ভারতীয় কালগণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। আজও এটি আমাদের পঞ্জিকায় ব্যবহার করা হয়। বছরকে 'সংবৎসর' বলা হয় এবং প্রতিটি সংবৎসরের একটি বিশেষ নাম আছে। শকাব্দের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টাব্দ ৭৮ সালে।

চলতি বছর শক কালগণনায় কততম, তা জানতে হলে নীচের হিসাব করো -

খ্রিস্টাব্দের চলতি বছর থেকে ৭৮ বিয়োগ করলে চলতি শক বছর কোনটি তা বোঝা যাবে।

উদাহরণ - খ্রিস্টাব্দ ২০২৬ - ৭৮ - বর্তমান শক বছর ১৯৪৮

তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের শুরুতেও তোমরা এরকম তারিখ দেখতে পাবে। দেখো তো!

করে দেখো।

উপরের উদাহরণের সাহায্যে তোমার পরিবারের সদস্যদের বা বন্ধুবান্ধবদের জন্মবছরের শক সংবৎসর খুঁজে বের করো।

৮.৫. সাতবাহন বংশ

সাতবাহন বংশ মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত। মৌর্যোত্তর কালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা পড়েছিল। বিদেশি আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে **সিমুক নামক রাজা সাতবাহন বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন।** সাতবাহনরা মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ এই অঞ্চলগুলিতে তাঁদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। সাতবাহনদের মধ্যে সবচেয়ে **বিখ্যাত ও শক্তিশালী রাজা** হলেন **গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী**। তিনি শক ও যবনের মতো বিদেশি শক্তিগুলিকে পরাজিত করে ভারতের মধ্যপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল ও সংঘবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। তাঁর পরাক্রমের বর্ণনা তাঁর মা গৌতমী বলশ্রীর নাসিকের ত্রিরশ্মি গুহার শিলালিপিতে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁকে 'ত্রিসমুদ্রতোয়পীতবাহন' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর অর্থ হল যাঁর ঘোড়া তিনটি সমুদ্রের জল পান করেছে। তিনটি সমুদ্র মানে আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর। তাঁর আমলে সাতবাহনদের সাম্রাজ্য উত্তরে নর্মদা নদী থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাতবাহনদের আমলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। তাঁদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে রেশম পথ ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যমার্গ যেত। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের রোম, গ্রিসের মতো দূরের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য হল।

তোমরা জানো কী ?

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর রাজা পুলুমাবীর মুদ্রায় একটি জাহাজের ছবি রয়েছে। মুদ্রার এই ছবিটি সাতবাহন আমলের সমুদ্রপথে বাণিজ্যের নিদর্শন।

তাঁদের মুদ্রায় ব্রাহ্মী ও প্রাকৃত ভাষায় লেখা পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক দিক থেকে সাতবাহন আমলকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয়। এই কালে বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব বাড়ল এবং অনেক বৌদ্ধ গুহামন্দির খোদাই করা হল। নাসিক, কার্লে, কানহেরি, ভাজা, পিতলখোরা এই বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলি সাতবাহন যুগের।

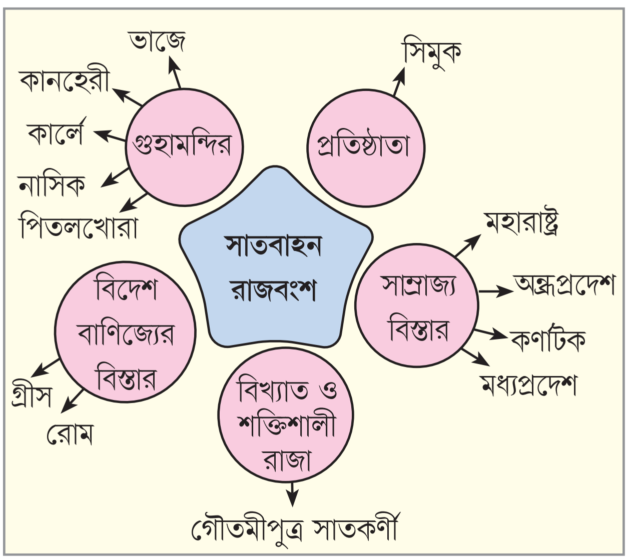

৮.৬. কুশাণ শাসক

কুশাণ বংশ মূলত মধ্য এশিয়ার ছিল। তারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং পরে উত্তর ভারতে প্রবেশ করল এবং ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল। **কুশাণ বংশের মধ্যে সবচেয়ে মহান ও প্রভাবশালী রাজা হলেন সম্রাট কনিষ্ক**। কনিষ্কের আমলে কুশাণ সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিশাল হয়ে উঠেছিল। মথুরা অঞ্চল থেকে পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছিল।

কনিষ্ক তাঁর রাজধানী পুরুষপুর (আজকের পেশোয়ার)-এ স্থাপন করলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে বিশেষ উৎসাহ দিলেন। তাঁর আমলে বৌদ্ধ পরিষদ অনুষ্ঠিত হল। এই বৌদ্ধ পরিষদগুলিকে সঙ্গীতি বলা হয়।

কুশাণ রাজত্বে বাণিজ্য ও অর্থনীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেল। ভারত, চীন, রোম ও মধ্য এশিয়াকে যুক্ত করা বিখ্যাত রেশম পথ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই পথে মশলা, কাপড়, ধাতু, রেশম ও গহনার ব্যাপক বাণিজ্য হত। কুশাণরা সোনা ও রুপোর উৎকৃষ্ট মুদ্রা তৈরি করল। এই মুদ্রাগুলিতে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা পাওয়া যায়। যেমন হেরাক্লিস (গ্রিক দেবতা), অদোনক্ষো (ইরানি দেবতা), শিব (ভারতীয় দেবতা)। এতে কুশাণদের উপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার প্রভাব স্পষ্ট হয়।

তোমরা জানো কী ?

কনিষ্কের শাসনকালে চতুর্থ বৌদ্ধ পরিষদ কুণ্ডলবন (কাশ্মীর)-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরিষদে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষাগুলি নতুনভাবে উপস্থাপন করা হল এবং বৌদ্ধ দর্শন আরও ব্যাপক আকারে তুলে ধরা হল। এই পরিষদে 'হীনযান' ও 'মহাযান' এই দুটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হল। মহাযান সম্প্রদায় মূর্তিপূজার স্বীকৃতি দিল। তার ফলে এই যুগে মথুরা ও গান্ধার শিল্পশৈলীতে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমা নির্মিত হল।

একটু ভেবে দেখো।

মুদ্রাবিদ্যার গবেষকরা মুদ্রা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তার ভিত্তিতে সেই সেই যুগের ইতিহাস রচনা করেন। তুমিও এই চেষ্টা করে দেখো।

ছবিতে দেওয়া কনিষ্কের মুদ্রাটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো। মুদ্রার দুটি পিঠের ছবি ও লেখা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে তা খাতায় এঁকে রাখো।

সমুদ্রগুপ্ত যুগের মুদ্রা

৮.৭. গুপ্ত বংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল প্রাচীন ভারতের 'সুবর্ণযুগ' বলে বিবেচিত হয়। **শ্রীগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা।** গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু হয়েছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমল থেকে। তাঁর পরে ক্ষমতায় আসা সমুদ্রগুপ্তের পরাক্রমের বর্ণনা তাঁর দরবারের কবি হরিষেণ রচিত প্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রশস্তি এলাহাবাদের অশোক স্তম্ভে সম্রাট অশোকের লেখার নীচে খোদাই করা আছে। ভারতে কাশ্মীর থেকে নর্মদা পর্যন্ত এবং ওড়িশার দিক দিয়ে দক্ষিণে কাঞ্চীপুরম পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন। পরে রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ওরফে বিক্রমাদিত্যের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছাল। তাঁর জয় করা শকদের উপর বিজয় তাঁর শাসনকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। তাঁর আমলে ফা-হিয়েন নামে একজন চিনা পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রশংসা করেছেন। তাঁর দরবারে কালিদাস, ধন্বন্তরি, বরাহমিহিরের মতো মহান পণ্ডিতরা ছিলেন।

গুপ্ত রাজাদের আমলে কলা, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুশিল্প, শিক্ষা ও ধর্মের বিকাশ ঘটল। **স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা।**

তোমার মত কী ?

গুপ্তযুগকে কেন 'সুবর্ণযুগ' বলা হয় ?

৮.৮. বর্ধন বংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে উত্তর ভারতে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হল। বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজা ক্ষমতা পেতে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। এই অস্থির পরিস্থিতিতে বর্ধন বংশের উদয় হল। দিল্লির কাছে থানেশ্বরে প্রভাকরবর্ধন নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলে বর্ধন বংশ প্রভাবশালী হয়ে উঠল। তবে এই বংশটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেল তাঁর পুত্র সম্রাট হর্ষবর্ধনের কারণে। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য তৈরি করলেন। হর্ষবর্ধন কনৌজে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। তাঁর সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হর্ষবর্ধন একজন ধর্মপ্রাণ, দয়ালু, প্রজাবৎসল ও দানশীল রাজা হিসেবে পরিচিত। তিনি ধর্মীয় উৎসবগুলিকে উৎসাহিত করলেন। দরিদ্র ও অভাবী মানুষের জন্য দানধর্মের ব্যবস্থা করলেন।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত
উ
ভারতের বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমা
০
৫০০ কিলোমিটার
গুপ্তের সাম্রাজ্য
আধুনিক শহর
হিন্দুকুশ পর্বত
পুরুষপুর
কাশ্মীর
তিব্বত
নেপাল
কামরূপ
সিন্ধু নদী
দিল্লী (ইন্দ্রপ্রস্থ)
যমুনা নদী
কনৌজ
গঙ্গা নদী
বৈশালী
পাটলি পুত্র
চম্পা
চম্বল নদী
প্রয়াগ
কাশী
বোধগয়া
মালবা
বুন্দেলখন্ড
কচ্ছ
উজ্জৈন
সাঁচী
সৌরাষ্ট্র
বলভী
ভরুচ
নর্মদা নদী
তাম্রলিপ্ত
তাপ্তী নদী
বাকাটক
মহানদী
সোপারা
গোদাবরী নদী
কৃষ্ণা নদী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
তুঙ্গভদ্রা নদী
পল্লব
কাবেরী নদী
কাঞ্চী
চোল
লাক্ষাদ্বীপ (ভারত)
আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভারত)
পান্ড্য
শ্রীলঙ্কা
হিন্দ মহাসাগর

তোমরা জানো কী ?

একবার হর্ষবর্ধন দেখলেন যে তাঁর রাজধানীর একটি দরিদ্র পরিবার অন্ন-জলের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। এটা বুঝতে পেরে রাজা নিজে রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে সেই পরিবারকে দান করলেন। তাঁর মনে হল যে শুধু খাবার দেওয়াই যথেষ্ট নয়, মানুষকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধাও দিতে হবে। তিনি আদেশ দিলেন যে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, চিকিৎসালয় তৈরি করতে হবে এবং ভিক্ষুকদের অন্ন ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। হর্ষবর্ধনের দানশীলতার কারণে রাজ্যের সকল প্রজা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করত।

একবার হর্ষবর্ধন তাঁর দরবারে সভা ডাকলেন এবং বললেন যে রাজ্যের প্রকৃত সমৃদ্ধি হল মানুষের আনন্দে ও কল্যাণে। যে দান করে সেই হল প্রকৃত শক্তিশালী রাজা। চিনা পর্যটক হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণবিবরণেও হর্ষবর্ধনের দানশীলতার কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগরাজে দানের এক বিশাল উৎসব আয়োজন করতেন। এই উৎসবে প্রতিবারই তিনি তাঁর কাছে থাকা সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি দান করে দিতেন।

হর্ষবর্ধনের এই দানধর্ম এতটাই বিখ্যাত হয়েছিল যে আজও তাঁকে 'দানশীল' সম্রাট হিসেবে স্মরণ করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের চালুক্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষ হয়েছিল। চালুক্যদের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁর দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ রুখে দিলেন। তাই হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য গঙ্গা অববাহিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। তাঁর মৃত্যুর পরে বর্ধন সাম্রাজ্যের পতন হল।

করে দেখো।

একটি মানচিত্র-খাতা তৈরি করো। প্রতিটি বংশ দেখানোর জন্য স্টেনসিলের সাহায্যে ভারতের মানচিত্র আঁকো। প্রতিটি বংশের অঞ্চলকে আলাদা রঙ দাও এবং তাদের রাজধানী, উল্লেখযোগ্য স্থান, বাণিজ্যপথের জন্য কিছু চিহ্ন ব্যবহার করো।

অনুশীলনী

প্র. ১ ক) এক কথায় উত্তর লেখো।

১. মৌর্য সেনাবাহিনীর সেনাপতি।

২. কণ্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৩. বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও মিনেন্দারের মধ্যে ঘটা সংলাপের গ্রন্থ।

৪. ভারতীয় কালগণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

খ) কে বলো।

১. 'ত্রিসমুদ্রতোয়পীতবাহন' বলে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে।

২. যাঁর শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্মের চতুর্থ পরিষদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৩. যিনি গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচিত হন।

৪. যিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তাঁর কাছে থাকা সমস্ত সম্পদ দান করতেন।

৫. যিনি হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে বর্ধন সাম্রাজ্যের দক্ষিণমুখী বিস্তার রুখে দিয়েছিলেন।

প্র. ২ ক) ধারণাচিত্র সম্পূর্ণ করো।

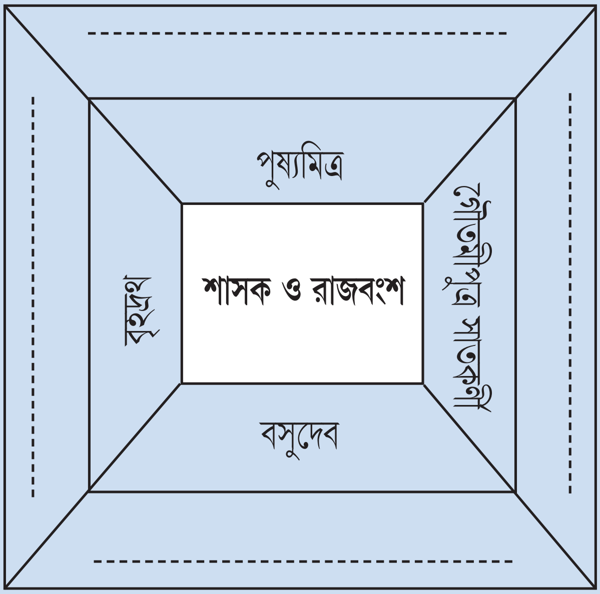

খ) নীচের ঘটনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজাও।

১. সম্রাট অশোকের পরে মৌর্য সাম্রাজ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

২. বসুদেব কণ্ব ছিলেন কণ্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৩. মৌর্য সেনাবাহিনীর সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ক্ষমতা হস্তগত করলেন।

৪. দেবভূতি ছিলেন শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা।

প্র. ৩ ক) সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখো।

১. ইন্দো-গ্রিক রাজাদের মুদ্রা।

২. কুশাণ শাসকদের উপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার প্রভাব।

খ) কারণ লেখো।

১. প্রাচীন কালে ভারতে আসা বিদেশি পর্যটকদের লেখা ভ্রমণবিবরণ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

২. গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়।

কৃতি-কার্যক্রম

তুমি তোমার মা-বাবার সাথে ঘুরতে গেলে সেই বিষয়ে নোট লিখে রাখো।

যেমন:

- কোন যানবাহনে সেখানে গিয়েছিলে ?
- সেখানে কী দেখেছিলে ?
- ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।
- সেই জায়গার শিল্প, ভাষা, খাবার।

উপক্রম

- সাতবাহন যুগের ঐতিহাসিক স্থানগুলি মানচিত্রে দেখাও।
- কোনো দেশের মুদ্রা সেই দেশের বৈশিষ্ট্য ও নীতি প্রতিফলিত করে। ভারতের কাগজি নোটগুলি লক্ষ্য করে সেগুলিতে থাকা বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি লেখো।

***

৯ প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

৯.১.প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন।
৯.২.প্রাচীন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবন।
৯.৩. প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান।
৯.৪. মহারাষ্ট্রের মিশ্র সংস্কৃতি।
৯.৫. প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা।

ছাত্রছাত্রীরা, একটু কল্পনা করো আমাদের কাছে পরম্পরাগতভাবে আসা এমন একটি ভান্ডার আছে, যাতে সোনা, মানিক বা মুদ্রা কিছুই নেই। তবুও সেটি অমূল্য ! আজ আমরা এই অমূল্য ভান্ডারের রহস্য উন্মোচন করব। এই ভান্ডারটি হলো ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার !

চলো তাহলে এই রত্নভাণ্ডারটি আস্তে আস্তে খুলে দেখি এবং আমাদের দেশ যা আগলে রেখেছে সেই কলা, ঐতিহ্য, নৃত্য, সংগীত ও প্রাচীন স্থাপত্যের অনন্য জগ আবিষ্কার করি !

ভেবে দেখো।

- আমাদের দেশে বৈচিত্র্য আছে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য আছে এ কথা কেন বলা হয় ?
- ভারতে কেন বিভিন্ন ভাষা, নৃত্য, পোশাক, রীতি ও ঐতিহ্য আছে ?
- অজন্তার গুহাগুলোর সুন্দর চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তোমাদের কেমন লাগে ?
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত এটা কি তোমরা জানো ?
- মহারাষ্ট্রের মাটিতে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এর কারণ কী হতে পারে বলে তোমাদের মনে হয় ?

এ সম্পর্কে আরও জানতে, জ্ঞান, কলা ও ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকার অনুভব করতে প্রস্তুত হও !

৯.১. প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। সেই সংস্কৃতির বহু দিক ছিল। এই দিকগুলোর ভিত্তিতে আমরা ভারতের ধর্ম, দর্শন, কলা, সাহিত্য, উৎসব, সামাজিক জীবন ও দৈনন্দিন ব্যবহারের এক সামগ্রিক পরিচয় পাই। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা, পোশাক, খাদ্য সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যকলার নানা দিক তৈরি হয়েছিল। এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও বসুধৈব কুটুম্বকম্ (সমগ্র পৃথিবী একটি পরিবার) এবং সর্বেভবন্তু সুখিনঃ (সকলে সুখী হোক) এই মূল্যবোধগুলো আমাদের সংস্কৃতিতে এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য দেখা যায়।

■ বাঙ্ময় ও সাহিত্য

এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মৌখিক পরম্পরায় যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে বাঙ্ময় বলে, আর লিখিত আকারে যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাকে সাহিত্য বলা হয়। এর মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্য, বৌদ্ধগ্রন্থ, জৈন গ্রন্থ, কাব্য, নাটক, নীতিশাস্ত্র, দর্শন

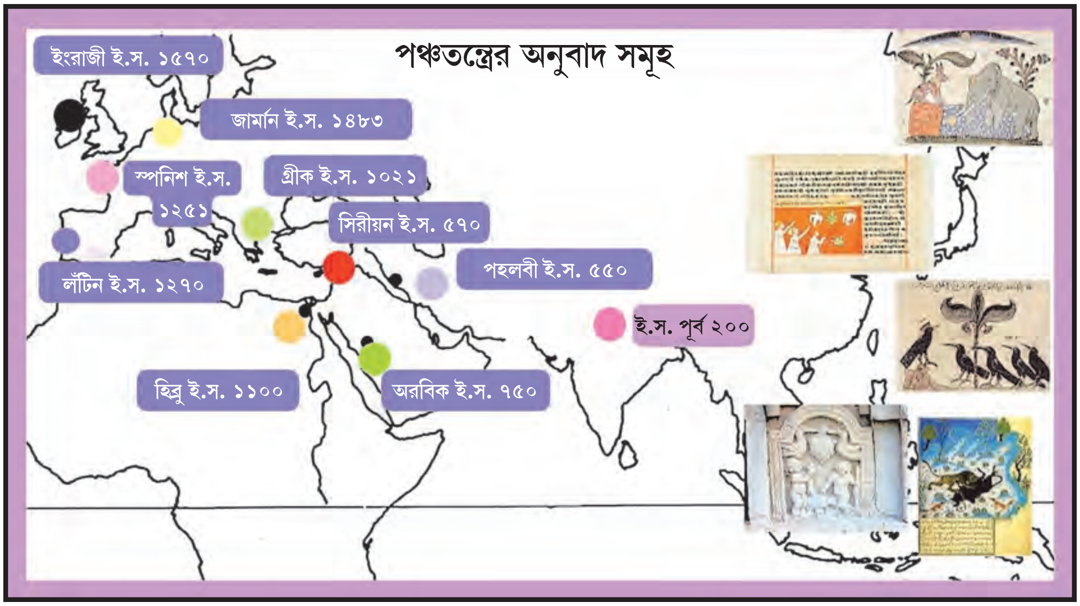

ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সবই অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্য ছিল জ্ঞান, দর্শন, নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যম। ব্যাকরণবিদ পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। এর উপর ভাষ্য রচনা করে পতঞ্জলি 'মহাভাষ্য' গ্রন্থলেখেন। মহাভারত ও রামায়ণের মতো মহাকাব্যগুলো সামাজিক আদর্শ, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও নীতিমূল্যবোধ শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনাকারী 'রাজতরঙ্গিণী' কবি কলহণ রচনা করেছেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' হলো ইতিহাসবিষয়কসাহিত্যযাপ্রাচীনকালেরচিতহয়েছিল।

তোমরা জানো কী ?

'পঞ্চতন্ত্র' হলো নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে রচিত প্রাচীন ভারতের একটি বিখ্যাত গল্প-সংকলন। এটি বিষ্ণুশর্মা রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলোর চরিত্র হলো সিংহ, বাঘ, হংস, কচ্ছপ, খরগোশের মতো পশুপাখি। কিন্তু সেই গল্পগুলোর মূল তাৎপর্য হলো মানুষের নৈতিক আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে পথ দেখানো।

এই সংকলনের গল্পগুলো কোন্ উপলক্ষে বলা হয়েছিল তারও একটি কাহিনি আছে -

প্রাচীন ভারতে অমরশক্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিনটি পুত্র ছিল, কিন্তু তিনজনেই পড়াশোনায় একদমই আগ্রহী ছিল না। রাজা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি পণ্ডিত শিক্ষক বিষ্ণুশর্মাকে ডেকে পাঠালেন এবং অনুরোধ করলেন যেন তিনি রাজকুমারদের বুদ্ধিমত্তা, ব্যবহারকুশলতা ও জীবনের পাঠ শেখান। বিষ্ণুশর্মা সেই ছেলেদের জ্ঞানী ও বিচক্ষণ করে তোলার সম্মতি দিলেন। তিনি শেখানোর এক ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করলেন গ্রন্থের মাধ্যমে নয়, গল্পের মাধ্যমে! তিনি পশুপাখির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট গল্প তৈরি করলেন। এই গল্পগুলোতে চাতুর্য, বন্ধুত্ব, সাহস, নীতি, বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ খোঁজা, বিশ্বাস ও ব্যবহারকুশলতার মতো পাঠ লুকিয়ে থাকত। রাজকুমাররা এই গল্পগুলোতে এতটাই মেতে গেল যে খেলার ছলেই তারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো সহজে পেয়ে গেল এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তারা বিচক্ষণ, বোধসম্পন্ন ও রাজ্যশাসনের উপযুক্ত হয়ে উঠল।

এই সমস্ত গল্পের সংকলন পঞ্চতন্ত্র নামে পরিচিত হয়, যার অর্থ পাঁচটি তন্ত্র বা পাঁচটি

জ্ঞানশাস্ত্র। বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জায়গায় এই গল্পগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম বড় আগ্রহে পড়া ও বলা হয়েছে। পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে - এ থেকেই এর জনপ্রিয়তা বোঝা যায়।

তেমনই জাতক গল্পগুলো সহজ ভাষায়, পশুপাখি ও মানুষের চরিত্রের মাধ্যমে উচিত-অনুচিতের বোধ দেয়।

করে দেখো।

তোমরা কি পঞ্চতন্ত্রের কোনো গল্প বা জাতক কথা জানো? না জানলে গ্রন্থাগারের বই থেকে অবশ্যই পড়ো এবং শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করো।

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা	প্রাচীন ভারতের সংগীতকলা	প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা
✻ প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা অত্যন্ত উন্নত ছিল। ভরতমুনি ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে নৃত্য, নাটক, অভিনয়, সংগীত, রঙ্গমঞ্চ, নবরস, ভাব, পোশাক, সাজসজ্জা ও দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ নাট্যকলার সমস্ত দিক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আজও নাটক, নৃত্য ও অভিনয় শেখার সময় এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হয়। ✻ এই যুগের কিছু বিখ্যাত নাটক: – মৌর্য যুগের ভাস তেরোটি নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যে ‘স্বপ্নবাসবদত্তা’ বিখ্যাত। – মৌর্যোত্তর যুগে অশ্বঘোষ ‘সারিপুত্র-প্রকরণ’ নাটকটি লিখেছিলেন। – গুপ্তযুগের সাহিত্যে কালিদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি ‘শকুন্তলা’, ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ ও ‘বিক্রমোর্বশীয়’ এই তিনটি বিশ্বখ্যাত নাটক রচনা করেন। – এই যুগের আরও দুজন নাট্যকার হলেন শুদ্রক ও বিশাখদত্ত। শূদ্রক ‘মৃচ্ছকটিক’ এবং বিশাখদত্ত ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকটি রচনা করেন। মৃচ্ছকটিক হলো দশ অঙ্কের একটি সংস্কৃত নাটক। – হর্ষবর্ধন নিজে ‘রত্নাবলী’, ‘প্রিয়দর্শিকা’ ও ‘নাগানন্দ’ এই তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়।	✻ ভারতীয় সংগীত পরম্পরার উৎস সামবেদে আছে। ✻ আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারটিকে উপবেদ বলা হয়। তার মধ্যে গান্ধর্ববেদকে ভারতীয় সংগীত, নৃত্য ও বাদনের উৎস বলে মনে করা হয়। ✻ ‘সংগীত রত্নাকর’ হলো সংগীতবিষয়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি শারঙ্গদেব নামে এক সংগীতবিশারদ রচনা করেন।	✻ বৈদিক আমল থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ✻ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছে। ✻ ভারতীয় নৃত্যকলায় কথক, কথাকলি, ভরতনাট্যম, মণিপুরি, ওড়িসি, কুচিপুড়ি ও মোহিনীঅট্টম এই সাতটি ধ্রুপদী নৃত্যপরম্পরা আছে বলে মনে করা হয়। ✻ এ ছাড়া প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে লোকনৃত্য পরিবেশন করা হতো। উৎসব ও বিশেষ অনুষ্ঠানে আনন্দ প্রকাশ করতে নৃত্য করা হতো। লোকনৃত্য স্বতঃস্ফূর্ত এবং কালক্রমে তা থেকেই লোকপরম্পরা তৈরি হয়।

■ কলা ও স্থাপত্য

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যকলা, চিত্রকলা এই সব ধরনেই শিল্পীর দক্ষতা ও তার সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। অজন্তার গুহাচিত্রগুলো সারা বিশ্বে বিখ্যাত। এই চিত্রগুলোতে বিভিন্ন গাছপালা, মাটি ও পাথর থেকে তৈরি প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রের মানুষের গয়না, পোশাক ও চুলের সাজের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর বিবরণ দেখানো হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সেই যুগের জীবনযাত্রা, নৃত্য-বাদ্যযন্ত্র, গাছপালা ও পাখির সুন্দর চিত্রণও দেখা যায়। ইলোরার গুহাগুলোতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গুহা দেখতে পাওয়া যায়। ইলোরার কৈলাস গুহামন্দির পৃথিবীর এক অদ্ভুত মন্দির। এর থেকেই আগে চূড়া পরে ভিত্তি এই রীতিটি প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। একটি বিশাল পাথরের খণ্ড কেটে এই গুহার নির্মাণ শুরু হয়েছিল চূড়া থেকে ভিত্তি পর্যন্ত। যার ফলে দর্শকরা এই মন্দির দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। মন্দিরে সুন্দর ভাস্কর্য, উঁচু স্তম্ভ, নন্দিমণ্ডপের মতো অপূর্ব খোদাই কাজ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাস্কর্যগুলোতে বিভিন্ন দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনির দৃশ্যও খোদাই করা আছে।

কৈলাশ মন্দির, ইলোরা

বৌদ্ধ গুহাগুলোতে স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্যগৃহ ও বিহার এগুলো সেই যুগের স্থাপত্যের প্রধান উপাদান। স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত স্তূপ হলো ভারতীয় স্থাপত্যকলার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। সম্রাট অশোকের আমলে সাঁচিতে স্তূপ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে, সাতবাহন যুগে সাঁচি স্তূপের চারপাশে চারটি বিশাল তোরণ (প্রবেশদ্বার) তৈরি করা হয়। তাতে সিংহ, হাতি প্রভৃতির আকৃতি খোদাই করা হয়। বুদ্ধের

সাঁচি স্তূপ

জীবনচরিত্রের ঘটনাগুলোও খোদাই করা আছে। অন্যান্য প্রাচীন স্তূপেও এই ধরনের আকৃতি খোদাই করা দেখা যায়। স্তূপের পাশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মালোচনা বা উপাসনার জন্য একটি সভাগৃহ তৈরি করা হতো। তাকে চৈত্যগৃহ বলা হয়। কার্লে গুহার চৈত্যগৃহ এই স্থাপত্যকলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চৈত্যগৃহের কাছেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসের জন্য গুহা খোদাই করা হতো। তাদের 'বিহার' বলা হতো। মহারাষ্ট্রের ভাজে গ্রামের বিহারকে সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। নাসিক, বেদসে, অজন্তা প্রভৃতি স্থানের বিহারগুলোও বিখ্যাত। ওড়িশার খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির জৈন গুহাগুলোও বিখ্যাত।

তোমরা জানো কী ?

এ ছাড়া দিল্লির মেহরোলিতে অবস্থিত লৌহস্তম্ভটি ভারতের প্রাচীন ধাতুবিজ্ঞানের জ্ঞান কতটা উন্নত ছিল তার এক অনন্য নিদর্শন। এই স্তম্ভটি গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ওরফে বিক্রমাদিত্যের আমলে নির্মিত হয়েছিল। এই স্তম্ভ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এটি ১৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেও আজ পর্যন্ত কোথাও মরচে পড়েনি।

লৌহস্তম্ভ

৯.২. প্রাচীন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবন

এই যুগে কৃষি ছিল প্রধান পেশা। মানুষের খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও দৈনন্দিনপ্রয়োজন মেটাতে কৃষি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণার মতো নদীগুলো কৃষির পক্ষে সহায়ক ছিল। দেশীয় ও বিদেশি বাণিজ্য সমুদ্রপথে ও স্থলপথে বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে খাদ্যশস্যের পাশাপাশি কাপড়, মশলা, ধাতু, গয়না, হাতির দাঁত, মূল্যবান রত্ন পাথরের মতো পণ্যের ব্যাপক ব্যবসা চলত। বিশেষত মহারাষ্ট্রের সাতবাহন যুগে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মশলা, রেশমি কাপড়, পুঁতি ও গয়নার মতো পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি বিপুল পরিমাণে হতো। নতুন বাজার তৈরি হয়েছিলএবং মুদ্রাব্যবস্থা সুপরিকল্পিত ছিল। তেমনই যথাযথ কর ব্যবস্থাও পরিচালিত হতো। এর ফলে রাজ্যের অর্থনীতি সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল ছিল। কৃষির পাশাপাশি বস্ত্রশিল্প, লোহা ও তামার মতো ধাতুর পণ্য উৎপাদন এই শিল্পগুলোও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাণিজ্যপথে বন্দর, বাজার ও নগর গড়ে উঠছিল। এই সমস্ত কারণে প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী ছিল। এর প্রভাব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনেও দেখা যেত।

তোমরা জানো কী ?

সাতবাহনদের আমল থেকে দক্ষিণে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সমৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। কৃষিতে সমৃদ্ধি, ক্রমবর্ধত শিল্প ও গৃহনির্মাণের ফলে দক্ষিণে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন রাজত্বকালে অনেক নগর গড়ে উঠেছিল। যেমন প্রতিষ্ঠান (পৈঠণ), তগর (তের), নাসিক, করহাটক (কানহাড) প্রভৃতি। এরকম প্রাচীর-বেষ্টিত অনেক নগর অস্তিত্বে ছিল। এই নগরগুলোর খননকাজে পাওয়া রোমান মুদ্রা থেকে সেই যুগের উন্নত বাণিজ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সোপারা, কল্যাণ, ভরুচ ছিল সেই যুগের প্রধান বন্দর। জুন্নার ও নাসিকের শিলালেখতে কুলারিক (মাটির পাত্র তৈরিকারী), তিলপিষক (তেলের ঘানিতে কাজ করেন যিনি), কোলিক (তাঁতি) এই ধরনের বহু পেশাদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পেশাদাররা নগরে একত্রিত হয়েছিলেন বলে দেখা যায়।

তুমি কী করবে ?

তুমি যদি সেই যুগে ব্যবসায়ী হতে, তাহলে কোন ধরনের ব্যবসা করতে ভালো লাগত ? কেন ?

৯.৩. প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান

ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎস অথর্ববেদের একটি অংশ আয়ুর্বেদ থেকে। এই যুগে জীবক, সুশ্রুত, চরকের মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসকরা শরীরের গঠন, অস্ত্রোপচার, ঔষধ প্রস্তুতি, রোগ নিরাময় ও খাদ্যাভ্যাসের নিয়ম সম্পর্কে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থগুলী ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধার স্তম্ভ ।

- জীবক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তিনি ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তক্ষশীলা চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন। অস্ত্রোপচার, ঔষধীয়-চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।
- সুশ্রুত ‘সুশ্রুতসংহিতা’ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে চিকিৎসা শিক্ষা, ওষুধ-চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হয়েছে।
- চরক ‘চরকসংহিতা’ গ্রন্থে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ওষুধের সঠিক ব্যবহার, খাদ্য-বিহার ও জীবনযাত্রার নিয়মের বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটি আরব, তিব্বত, চিন প্রভৃতি দেশেও বিখ্যাত ছিল।

তোমরা জানো কী ?

‘সুশ্রুতসংহিতা’ গ্রন্থে সুশ্রুত বহু অস্ত্রোপচার ও সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন। পেটের অস্ত্রোপচার, কৃত্রিম নাক বসানো, ত্বক প্রতিস্থাপন এই ধরনের অস্ত্রোপচারও সুশ্রুতসংহিতায় বর্ণিত আছে তেমনই মোট ১১২০টি রোগের লক্ষণসহ তালিকা দেওয়া হয়েছে। সুশ্রুতকে অস্ত্রোপচারের ‘আদিজনক’ (জনক) বলে মনে করা হয়। নাকের শল্যচিকিৎসার জন্য তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি ছিল অভিনব। নাক কেটে যাওয়ার ফলে আসা বিকৃতি দূর করতে নাকের অস্ত্রোপচারে সুশ্রুত প্রথমে গালের চামড়া ব্যবহার করেছিলেন। সুশ্রুতের বিকশিত কৌশলগুলো পরে ১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা অধ্যয়ন করেন। এই অস্ত্রোপচারে যে অংশের চামড়া ব্যবহার করা হয় তাকে আজও ‘ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাপ’ বলা হয়। এ থেকেই সুশ্রুতের মহত্ব স্পষ্ট হয়।

সুশ্রুতসংহিতা গ্রন্থে দেওয়া শল্যচিকিৎসার উপকরণ

৯.৪. মহারাষ্ট্রের মিশ্র সংস্কৃতি

মহারাষ্ট্র হলো ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন কাল থেকে সাতবাহন, বাকাটক রাজবংশ মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করেছে, ফলে এখানে ধর্ম, কলা, ভাষা, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের এক অনন্য সংগম ঘটেছে। মহারাষ্ট্র অঞ্চলকে প্রাচীন ভারতের ‘মেল্টিং পট’ (মিশ্রণের পাত্র) বলা হয়। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সহ্যাদ্রি পর্বতমালা, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর-উপত্যকা এবং আরব সাগরের তীর এই সমস্ত কারণে এই অঞ্চলে বাণিজ্য, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদান সহজ হয়েছিল। অজন্তা, ইলোরা, কানহেরির গুহাগুলোতে বৌদ্ধ ও জৈন কলার পরিচয় পাওয়া যায়, আর স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্যকলা ও শিলালেখের মাধ্যমে ইতিহাস ও তৎকালীন সমাজের সন্ধান পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। ভাষা ও সাহিত্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। মারাঠি, প্রাকৃত, সংস্কৃতের মিলন মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে দেখা যায়। তেমনই কলা, সংগীত, নাট্য, ভাস্কর্যকলা ও স্থাপত্যকলার বিকাশ ঘটেছিল।

তোমরা জানো কী ?

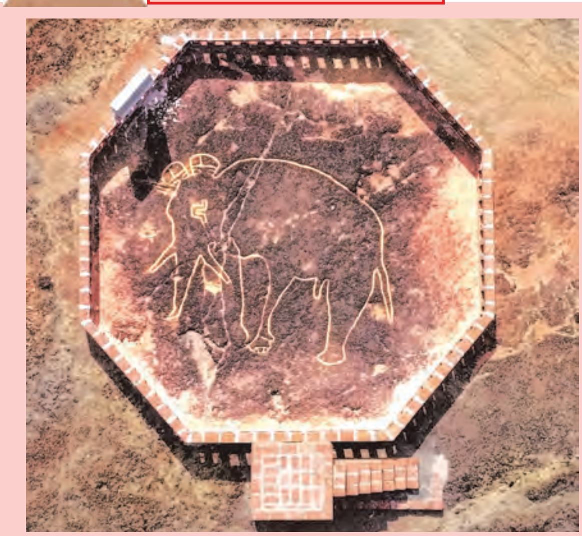

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, প্রদত্ত ছবিগুলো সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করো। এগুলো কিসের ছবি তা তোমরা জানো কি ?

পাথুরে মাটিতে এই ভাস্কর্যগুলো হাজার হাজার বছর আগে খোদাই করে রাখা হয়েছে। সূর্য, পশুপাখি, নৃত্যরত মানুষ, শিকারি, বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত চিত্র রয়েছে। এগুলোকে 'কাতালশিল্প' (শৈলচিত্র) বলা হয়। মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণ অঞ্চলে বিশেষত রত্নাগিরি, রাজাপুরে অনেক জায়গায় এই রহস্যময় খোদাই ভাস্কর্যচিত্রগুলো আজও বিদ্যমান।

এই শৈলচিত্রগুলো মহারাষ্ট্রের অনন্য ও প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

৯.৫. প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

ছাত্রছাত্রীদের গুরুকূল পদ্ধতিতে পড়ানো হতো। শিক্ষার শুরু হতো গৃহশিক্ষার মাধ্যমে। এরপর ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী গুরুকূলে শিক্ষা হতো। তারপর নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলার মতো বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয়ে পড়াশোনা হতো। ছাত্রছাত্রীদের শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, ভাষা, সংগীত, ভাস্কর্যকলা, অস্ত্রবিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও স্থাপত্যকলা সম্পর্কে গভীর শিক্ষা দেওয়া হতো। গুরুকূল পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের আচার, সংস্কার, নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রার নিয়ম শেখানো হতো। প্রাচীন ভারতে মহিলাদেরও শিক্ষার অধিকার ছিল। লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো মহিলা শিষ্যের উল্লেখ কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায়।

■ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

তক্ষশিলা ছিল প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি। এটি আজকের পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির কাছে ছিল। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ভাষা ও ধর্মের মতো বিভিন্ন বিষয়ে গভীর শিক্ষা দেওয়া হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসত। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিক্ষা তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছিল। ব্যাকরণবিদ পাণিনি, চিকিৎসক চরক ও চিকিৎসক জীবকও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন।

■ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা ছিল প্রাচীন ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। এর ধ্বংসাবশেষ বিহার রাজ্যে রাজগীরের কাছে আজও দেখতে পাওয়া যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশেষকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজত্বকালে নালন্দার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শন, বেদ, গণিত, জ্যোতিষ, সাহিত্য, সংগীত ও কলা পড়ানো হতো। এখানে ১০, ০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষকরা আসতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে অত্যন্ত কঠিন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতো। তাতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

■ বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আজকের বিহারের ভাগলপুরের কাছে ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতরা ভর্তি পরীক্ষা নিতেন। এখানে মূলত বৌদ্ধ দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ ও সাহিত্যের পড়াশোনা হতো।

■ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র

প্রাচীন ভারতে নালন্দা, তক্ষশিলা ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বারাণসী, বলভী ও কৌশাম্বী ছিল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে কলা, স্থাপত্য

ও সাহিত্যের গভীর পড়াশোনা হতো। মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ আজকের পৈঠণ ছিল সাতবাহন যুগের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর ফলে ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার দূরদূরান্ত পর্যন্ত ঘটেছিল। দেখলে তো! ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কত অদ্ভুত। কলা, স্থাপত্য, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাচীন ভারত উন্নত ছিল। সত্যিই, এটি একটি অমূল্য সাংস্কৃতিক ভান্ডার!

করে দেখো।

এখন তোমরা এই সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি খোঁজো। সেই ছবিগুলোর রঙিন চার্ট, দেওয়ালচিত্র তৈরি করো। তোমাদের শ্রেণীকক্ষে বিদ্যালয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

অনুশীলনী

প্র.১ ক) শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. পতঞ্জলির .... হলো প্রাচীন যুগের একটি ব্যাকরণগ্রন্থ।

২. ভরতমুনি .... গ্রন্থ রচনা করেছেন।

খ) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

১. বিষ্ণুশর্মা নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে কোন্ গল্পসংকলন রচনা করেছিলেন?

২. গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত্র অবলম্বনে রচিত গল্পগুলোকে কী বলা হয়?

৩. কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনাকারী কবি কলহণের কাব্যসংকলনের নাম লেখো।

৪. সাতবাহন যুগের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র কোনটি?

প্র.২ ক) জোড়ি মিলাও।

'ক' দল	'খ' দল
১) শারঙ্গদেব	ক) শাকুন্তল
২) ভাস	খ) সংগীত রত্নাকর
৩) কালিদাস	গ) মুদ্রারাক্ষস
৪) বিশাখদত্ত	ঘ) স্বপ্নবাসবদত্ত

খ) সারণি পূর্ণ করো।

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়	বর্তমান স্থান
....	রাওলপিন্ডি
নালন্দা	....
....	ভাগলপুর

প্র.৩ ক) টীকা লেখো।

১. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

২. সুশ্রুতসংহিতা

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

১. ভারতের সাত ধ্রুপদী নৃত্যপ্রকার মূলত কোন্ কোন রাজ্যে আছে তাদের নাম লেখো।

২. দিল্লির মেহরোলিতে অবস্থিত লৌহস্তম্ভ সম্পর্কে তথ্য লেখো।

প্র.৪ বিস্তারিত উত্তর লেখো।

১. সাঁচির স্তূপের ছবি দেখো ও বর্ণনা লেখো।

৩. মহারাষ্ট্রের মিশ্র সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য লেখো।

প্র.৫ প্রাচীন যুগের শিক্ষা ও আধুনিক যুগের শিক্ষার তুলনা করো।

প্র.৬ ধাঁধা পূর্ণ করো।

১)

১) ম			২)
৩)			

খাড়া শব্দ

১) একটি প্রাচীন মহাকাব্য।

২) একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়।

আড়া শব্দ

৩) একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়।

উপক্রম

- তোমাদের এলাকার কোনো আয়ুর্বেদ চিকিসকের সঙ্গে দেখা করে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতির তথ্য লেখো।
- ইন্টারনেটের সাহায্যে শৈলচিত্রের ছবি খোঁজো।
- পঞ্চতন্ত্র ও জাতক কথা সংগ্রহ করে পড়ো এবং তার একটি গল্পের নাট্যরূপ প্রার্থনাসভায় উপস্থাপন করো।

***

১০ প্রাচীন ভারত ও বিশ্ব

১০.১. পারস্য সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ

১০.২. গ্রিক রোমান সংস্কৃতির ভারতের উপর প্রভাব

১০.৩. ভারত এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ

ভেবে দেখো।

এটি ভারতে পাওয়া একটি রোমান মুদ্রা। এই মুদ্রাটি ভারতে কীভাবে এসেছিল বলো ?

বাঁদিকের ছবিতে ইরানি সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সেপোলিসের স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে, এবং ডানদিকের ছবিতে একটি অশোকস্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। দুটির মধ্যে কোনো মিল আছে কি ?

এই ছবিটি তোমরা অষ্টম পাঠে দেখেছিলে। গৌতম বুদ্ধের এই মূর্তিতে গ্রিক শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এটা কেন হয়েছিল বলো ?

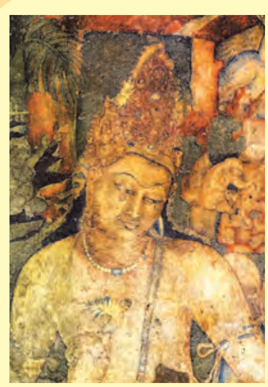

এই দুটি ছবির মধ্যে একটি ভারতেরএবং একটি শ্রীলঙ্কার। এই দুটির মধ্যে তোমরা কি কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছ ?

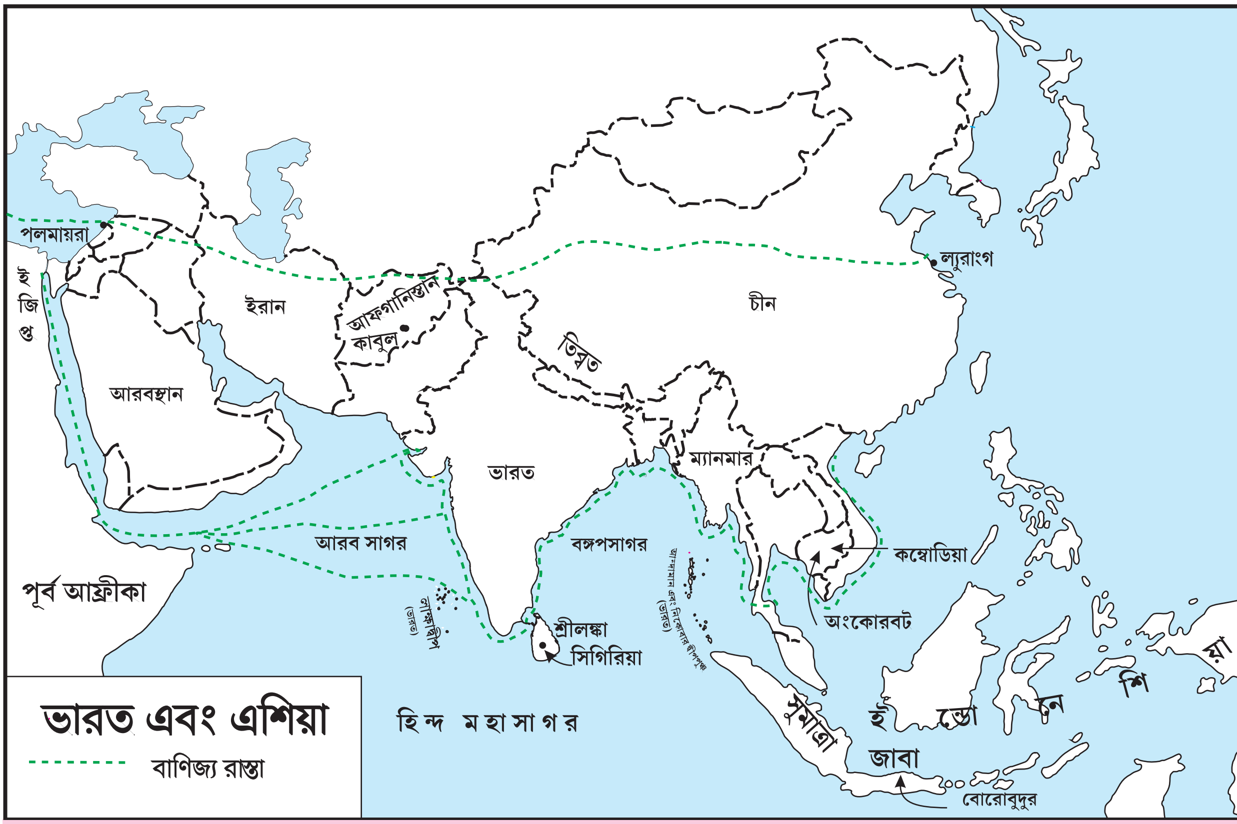

এই মানচিত্রটি ভারত ও এশিয়ার মধ্যেকার বাণিজ্যপথের। এই পথে কোন কোন পণ্যের ব্যবসা হয়েছিল বলে তোমরা মনে করো ?

এই সমস্ত ছবি থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রাচীন ভারতের বাইরের দেশগুলির সাথে সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলত। প্রাচীন কালে ভারত অনেক দেশের সাথে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু ছিল। হিমালয়ের ওপারের চীন ও তিব্বত, দক্ষিণের শ্রীলঙ্কা, পূর্বের মায়ানমার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আর পশ্চিমের ইরান (পারস্য) এবং মধ্য এশিয়ার অঞ্চলগুলির সাথে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এই দেশগুলির সাথে ক্রমাগত আদান-প্রদানের ফলে ভারতের ধর্মগুলির প্রসার ঘটেছিল। বাণিজ্যপথের বিস্তার হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্পশৈলীর মিশ্রণ ঘটেছিল এবং এর মধ্য দিয়ে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠ ছিল।

করে দেখো।

তোমার পরিবারের কোনো সদস্য, তোমার প্রতিবেশী বা অন্য কোনো আত্মীয় কি বিদেশে গিয়েছেন ? তাঁদের একটি ছোট সাক্ষাৎকার নাও। সেখানে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জেনে নাও। ভারতে এবং সেই দেশে তাঁরা কী কী মিল খুঁজে পেয়েছেন সেটাও অবশ্যই জেনে নাও।

১০.১. পারস্য সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ

প্রাচীন ভারত ও পারস্য (আজকের ইরান)-এর মধ্যে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক হাজার হাজার বছর আগে থেকেই ছিল। ইরানি সংস্কৃতি বিশ্বের বিকশিত প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়। ইরানের সাম্রাজ্য রোম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সাম্রাজ্যের প্রশাসন ছিল সুশৃঙ্খল। সেখানকার ভাস্কর্যকলা উচ্চমানের ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। ইরানি সাম্রাজ্যকে আকেমেনিড সাম্রাজ্য বলে পরিচিত। সম্রাট দারায়ুসের সাম্রাজ্যে গান্ধার ও সিন্ধু অঞ্চল অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যশাসন পদ্ধতিতে ইরানি প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রভাব লক্ষ করা যায়। পারসিকরা প্রশাসনিক

ব্যবস্থায় প্রদেশ বিভাজন, কর ব্যবস্থা, গুপ্তচর ব্যবস্থা এবং কর্মকর্তাদের শ্রেণীবিন্যাসের মতো বিষয়গুলি পদ্ধতিগতভাবে গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজ্যশাসনে এইসব বিষয়ের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

সম্রাট অশোকের 'লেখে' যে লিপিগুলি দেখা যায় তার মধ্যে খরোষ্ঠী এবং আরামাইক লিপির উৎপত্তি পারসিক লিপি থেকে হয়েছে। এই লিপিতে খোদাই করা লেখগুলি ডান থেকে বামে লেখা। এই লিপি মূলত শিলালেখ ও মুদ্রায় দেখা যায়।

ভারত পারস্যে কাপড়, মুক্তো, হাতি, মশলা রপ্তানি করত, আর পারস্য থেকে ধাতু ও মূল্যবান বস্তু আমদানি করত।

মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাস্কর্যকলা ও স্থাপত্যে পারসিক শিল্প ও স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রভাব প্রধানত মৌর্যদের রাজদরবারের স্তম্ভ, ভাস্কর্যকলা এবং নকশাকাটা কাজে দেখা যায়। সেগুলিতে সিংহ, অশ্ব বা বৃষের ভাস্কর্য খোদাই করা আছে।

১০.২. গ্রিক-রোমান সংস্কৃতির ভারতের উপর প্রভাব

সম্রাট আলেকজান্ডার

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার পারস্য জয় করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা গ্রিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছিল। তিনি সিন্ধু অঞ্চলের অনেক ছোট ছোট রাজ্য তাঁর অধীনে এনেছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল এবং যবন বা ইন্দো-গ্রিক রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। তাদের আমলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার ফলে শিল্পকলা, ভাস্কর্যকলা, মুদ্রা, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও সম্রাট অশোকের গ্রিক রাজাদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মেগাস্থিনিস ও ডিমাকাস ছিলেন সেলুকাসের দূত যাঁরা চন্দ্রগুপ্তের দরবারে ছিলেন। মেগাস্থিনিস রচিত 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ থেকে মৌর্য যুগের সমাজব্যবস্থা, প্রশাসন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির তথ্য পাওয়া যায়। গ্রিক মূর্তিকলার প্রভাবে কুশান আমলে ভারতে একটি নতুন শিল্পশৈলীর উদ্ভব হয়েছিল। তাকে 'গান্ধার শিল্প' বলা হয়। গান্ধার শিল্পশৈলীতে প্রধানত গৌতম বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। এই মূর্তিগুলি আফগানিস্তানের গান্ধার অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে পাওয়া গেছে, তাই সেই শৈলীকে গান্ধার শৈলী বলা হয়। এই শৈলীর মূর্তির চেহারা গ্রিক চেহারার সাথে মিলে যায়। ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রিক রাজাদের মুদ্রাগুলি এই শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সেই মুদ্রাগুলিকে 'ইন্দো-গ্রিক' মুদ্রা বলা হয়। সেই মুদ্রাগুলিতে গ্রিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বলো তো দেখি!

আমি সম্রাট নই, সৈনিকও নই,
তবু রাজদরবারে আমার স্থান।
বিদেশির চোখ দিয়ে ভারত দেখলাম,
যা দেখলাম তা জানাতে 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ রচনা করলাম। আমি কে?

খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারত ও রোমের মধ্যে বাণিজ্য জমজমাট হয়ে উঠেছিল। এই বাণিজ্যে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মহারাষ্ট্রের কোল্হাপুরে খননকার্যে কাঁসার কিছু বস্তু পাওয়া গেছে। সেগুলি

রোমান নির্মাণশৈলীর। তামিলনাড়ুর অরিকামেডুতে খননকার্যেও রোমান নির্মাণশৈলীর অনেক বস্তু পাওয়া গেছে।

তোমরা জানো কী ?

তের হল মহারাষ্ট্রের ধারাশিব জেলার সাতবাহন যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার খননকার্য থেকে রোমান মুদ্রা, এম্ফোরা পাত্র, কাচের পুঁতি এবং হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম খোদাইকাজের ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। তেরের কাপড়, মুক্তো, গহনা এবং হস্তশিল্পের বস্তু রোমান বাজারে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এর মধ্যে হাতির দাঁতের ১২ সেমি উঁচু খোদাইকাজের নারীমূর্তিটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একই ধরনের হাতির দাঁতের নারীমূর্তি খ্রিস্টীয় ৭৯ অব্দে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইটালির পোম্পেই প্রাচীন নগরীর খননকার্যে পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এবং রোমান নগরীর সাথে তার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

এইরকম অনেক বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ তৎকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই বাণিজ্যে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতীয় পণ্য আরব ব্যবসায়ীরা আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত নিয়ে যেত। সেখান থেকে সেগুলি ইউরোপের দেশগুলিতে পাঠানো হত। দক্ষিণ ভারতের বন্দর থেকে রোমান ব্যবসায়ীরা সরাসরি ভারতে আসত এবং কাপড়, মশলা, মূল্যবান রত্নপাথর, ওষধি গাছপালা প্রচুর পরিমাণে কিনে নিত। ভারতের উপকূল অঞ্চলে আজও হাজার হাজার রোমান মুদ্রা পাওয়া যায়। এর থেকে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ও সমৃদ্ধি বোঝা যায়।

তোমরা জানো কী ?

প্রাচীন কালে ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া গোল মরিচ ইউরোপে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু বলে বিবেচিত হত। রোমে এটি এতটাই দামি ছিল যে তাকে কালো সোনা বলা হত। রোমানদের খাদ্যে মশলার অভাব ছিল। মরিচ তাদের কাছে স্বাদ ও স্বাস্থ্য উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দক্ষিণ ভারতের বন্দর থেকে প্রচুর পরিমাণে মরিচ রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি করা হত। রোমান ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের থেকে সোনার মুদ্রা দিয়ে মরিচ কিনত। রোমান লেখক প্লিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে রোমে ভারত থেকে মশলা আনার জন্য প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে সোনা রোম থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই বাণিজ্য এতটাই বেড়েছিল যে বলা হত, ''রোমের সোনা ভারতে এসে এখানেই থেকে গেছে!''

বরবুদুর স্তূপ

১০.৩. ভারত এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ

প্রাচীন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও প্রভাবশালী। সামুদ্রিক বাণিজ্য, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রসার, ভাষা ও শিল্পকলার আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারতের প্রভাব শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মশলা, কাপড়, মূল্যবান রত্ন পাথর ও ধাতু নিয়ে সামুদ্রিক পথে এই দেশগুলিতে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধ দর্শনের প্রচার করেছিলেন, এই দেশগুলির মানুষেরা শিক্ষার জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং এখানকার সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মন্দির, নৃত্যকলা, শিল্পকলা, স্থাপত্য এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। অঙ্কোরভাটের মতো বিশাল মন্দির, বরবুদুর স্তূপ, রামায়ণ মহাকাব্য থেকে অনুপ্রাণিত শিল্পকলা এর প্রমাণ।

সিগিরিয়া গুহার দেওয়ালচিত্র

শ্রীলঙ্কা

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের দুজনেরনামের উল্লেখ শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ'-এ করাহয়েছে। সংঘমিত্রা নিজের সাথে বোধিবৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কার অনুরোধপুরে যে বোধিবৃক্ষটি আছে সেটি এই শাখা থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সেখানকার ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয়।

শ্রীলঙ্কার মুক্তো এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর ভারতে প্রচুর চাহিদা ছিল। সেখানকার সিগিরিয়া নামক স্থানে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কশ্যপ নামক এক রাজ্য গুহামন্দির খোদাই করিয়েছিলেন। সেই গুহার দেওয়ালচিত্রের শৈলী অজন্তার চিত্রশৈলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শ্রীলঙ্কার 'মহাবংশ' এবং 'দীপ-বংশ' নামক পালি ভাষার গ্রন্থ দুটি ভারত ও শ্রীলঙ্কার পারস্পরিক সম্পর্কের তথ্য প্রদান করে।

চীন

প্রাচীন কাল থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট হর্ষবর্ধন চীনের দরবারে রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। চীনে তৈরি রেশমি কাপড়কে ভারতে 'চীনাংশুক' বলা হত। চীনাংশুকের ভারতে প্রচুর চাহিদা ছিল। প্রাচীন ভারতের ব্যবসায়ীরা এই চীনাংশুক পশ্চিমের দেশগুলিতে পাঠাত। এই বাণিজ্য স্থলপথে হত। ভারত, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া পথকে রেশম পথ বলা হয়। ভারতের কিছু

প্রাচীন স্থান এই রেশম পথের সাথে যুক্ত ছিল। তার মধ্যে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের কাছে পালঘর জেলার নালাসোপারা একটি ছিল। ভারতে আসা ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাং নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও রেশম পথ ধরেই ভারতে এসেছিলেন। হিউয়েন সাংকে হিউয়েন সাং নামেও উল্লেখ করা হয়।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর চিনা সম্রাট 'মিং'-এর আমন্ত্রণে ধর্মরক্ষক এবং কশ্যপ মাতঙ্গ নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চীনে গিয়েছিলেন। তাঁরা অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ চিনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তারপর থেকে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে গতি এসেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এই দেশগুলিতেও পৌঁছে গিয়েছিল।

তোমরা জানো কী ?

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনের পণ্ডিত ভিক্ষু হিউয়েন সাং বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতে এসেছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেক বছর জ্ঞানসাধনা করেছিলেন। এখানকার পণ্ডিত ভিক্ষুরা তাঁকে বৌদ্ধ দর্শন, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধ্যানবিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থ দিয়েছিলেন। ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার সময় সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ৬০০-এর অধিক পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থগুলি চীনে নিয়ে গিয়ে সেখানকার মানুষকে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জানানো এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় সংকল্প। হিউয়েন সাং ভারত থেকে মধ্য এশিয়ার দিকে যাওয়া মরুভূমির পথ ধরলেন। সারাদিন ভয়ংকর রোদে হাঁটা এবং রাতে হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা এই কঠিন পরিস্থিতি ছিল। মরুভূমি তাঁর সাহসের পরীক্ষা নিচ্ছিল। তবু তিনি থামেননি, কারণ তাঁর কাছে থাকা গ্রন্থগুলি ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডার। একদিন তিনি তাকলামাকান মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চারদিকে বালির প্রচণ্ড ঝড় উঠল। উটের উপর নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হতে লাগল এবং গ্রন্থগুলি নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয় তাঁকে পেয়ে বসল। হিউয়েন সাং প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই গ্রন্থগুলিকে ঝড় থেকে বাঁচালেন। ধীরে ধীরে ঝড় শান্ত হতে লাগল। আকাশে আবার আলো দেখা দিল। ক্লান্ত, ধূলিমলিন হিউয়েন সাং উঠলেন এবং সবার আগে গ্রন্থের থলেটি খুলে দেখলেন। সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত গ্রন্থ অক্ষত ছিল!

বহু মাসের যাত্রার পর তিনি অবশেষে চীনে পৌঁছালেন। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানানো হল। সেখানকার কিছু পণ্ডিত তাঁর আনা গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন শুরু করলেন, সেগুলি অনুবাদ করলেন এবং তার ফলে পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। চীনের সম্রাটও তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর সংগ্রহের গ্রন্থগুলি অনুবাদ করার জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করলেন। হিউয়েন সাং পরবর্তী কয়েক বছরে ৭৫-রও বেশি বৌদ্ধ গ্রন্থের চিনা অনুবাদ করেছিলেন।

অঙ্কোরভাটের মন্দির

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

কম্বোডিয়ার 'ফুনান' প্রাচীন রাজ্যটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছিল। চিনা ঐতিহ্য অনুযায়ী কৌণ্ডিন্য নামে এক ভারতীয় এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। ফুনানের মানুষেরা সংস্কৃত ভাষা জানত। সেই যুগের একটি খোদাই শিলালেখ পাওয়া গেছে। সেটি সংস্কৃতে লেখা।

তোমরা জানো কী ?

চিনা পর্যটকদের নথিপত্র অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত শেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য নথি আছে। সেটি হল খ্রিস্টীয় ৬৭১ অব্দে ইসিং নামক এক চিনা বৌদ্ধ পর্যটক চীন থেকে ফেরা ইরানি বণিক জাহাজে করে ইন্দোনেশিয়ায় এসেছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীবিজয় রাজ্যে ছয় মাস সংস্কৃত ভাষা শিখতে এসে থেকেছিলেন। তারপর তিনি সমুদ্রপথে ভারতে এসেছিলেন। শ্রীবিজয় রাজ্যে এক থেকে দুই বছর সংস্কৃত শিখে তারপরে ভারতে যাওয়ার পরামর্শ ই-সিং তাঁর লেখায় চিনা ভিক্ষুদের দিয়েছেন। তাঁর নথি অনুযায়ী, সেই সময় শ্রীবিজয় রাজ্যের বিহারগুলিতে এক হাজার ভিক্ষু থাকতেন। সেই হিসেবে চীন থেকে ভারতে আসা চিনা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ইন্দোনেশিয়ায় কয়েক মাস সংস্কৃত শিখে তারপর ভারতে আসতেন। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ইন্দোনেশিয়ায় কতটা ব্যাপকভাবে পড়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতেও ভারত থেকে আসা কেউ কেউ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এই রাজ্যগুলির কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থেকেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়ায় আজও রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে নৃত্য-নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলিতে ভারতীয়

সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থেকেছিল। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ ধর্ম মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে পৌঁছে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল।

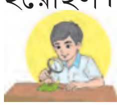

খুঁজে দেখো।

কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়ানমার এই দেশগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব আছে এমন কিছু স্থাপত্য ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বমর্যাদা পেয়েছে। সেগুলির তথ্য খুঁজে বের করো এবং তাদের একটি তালিকা তৈরি করো।

আজও ভারত ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই প্রাচীন কালের ইতিহাস আমাদের কেবল অতীত বুঝতেই সাহায্য করে না, বরং আজকের বিশ্বের সাথে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতেও সাহায্য করে।

অনুশীলনী

প্র.১ ক) সঠিক বিকল্পের সামনে ☑ চিহ্ন দাও।

১. গান্ধার শৈলীতে নির্মিত কোন ভাস্কর্যগুলো প্রচুর পরিমানে পাওয়া গিয়েছিল ?

ক) শিব ☐
খ) বিষ্ণু ☐
গ) গৌতম বুদ্ধ ☐

২. চীনের পণ্ডিত ভিক্ষু হিউয়েন সাং: ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর জ্ঞানসাধনা করেছিলেন ?

ক) তক্ষশীলা ☐
খ) বিক্রমশীলা ☐
গ) নালন্দা ☐

৩. রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে নৃত্য-নাটক কোন দেশে জনপ্রিয় ?

ক) ইন্দোনেশিয়া ☐
খ) থাইল্যান্ড ☐
গ) কম্বোডিয়া ☐

৪. রেশম পথ নীচের কোন দেশগুলির মধ্য দিয়ে যায় ?

ক) ভারত-শ্রীলঙ্কা-কম্বোডিয়া ☐
খ) ভারত-আফগানিস্তান-মধ্য এশিয়া ☐
গ) ভারত-ইন্দোনেশিয়া-চীন ☐

প্র.২ ক) নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

১. মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাস্কর্যকলা ও স্থাপত্যে পারসিক শিল্প-স্থাপত্যের প্রভাব কীভাবে দেখা যায় ?

২. ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ভারতের বাইরেও ব্যাপকভাবে হয়েছিল তার উদাহরণ লেখো।

৩. ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে অত্যন্ত নিবিড় ও প্রভাবশালী সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ লেখো।

খ) টীকা লেখো।

১. রেশম পথ

২. প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বের উপর প্রভাব

৩. গান্ধার ভাস্কর্য

প্র.৩ ধারণাচিত্রটি সম্পূর্ণ করো।

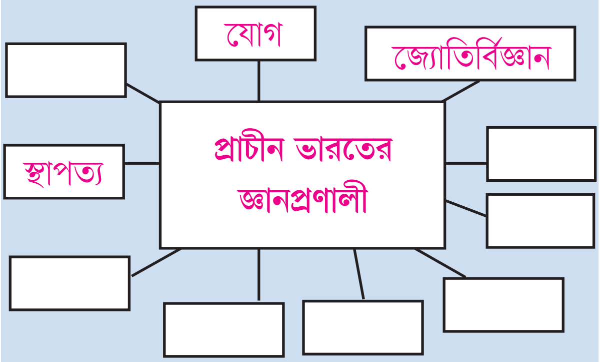

এসো করে দেখি।

- বিশ্বের মানচিত্রের রূপরেখায় যেখানে যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পৌঁছেছিল সেইসব স্থান দেখাও। যেমন শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া।
- ইন্টারনেটের সাহায্যে শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরে যে বোধিবৃক্ষটি আছে তার ছবি সংগ্রহ করে এবং সে সম্পর্কে উপযুক্ত ভাষায় তোমার টীকা লেখো।

উপক্রম

- ভারত এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে কোন কোন জিনিস আদান প্রদান হতো - সে গুলি দেখানোর একটি তালিকা তৈরী করো।
- উদা -

দেশ	ভারত থেকে কি নিয়েছে ?	ভারতের উপরে কি প্রভাব পড়েছিল ?
রোম	গোলমরিচ	ব্যাবসার জন্য সোনা ভারতে এসেছিল।
....	....	....

- হিউয়েন সাং অনেক ভারতীয় গ্রন্থ নিজের দেশে (চিনে) নিয়ে গিয়ে অনুবাদ কেন করেছিল এ বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে চর্চা করো।

শিল্প ফলক : গান্ধার শৈলী

***

নাগরিকশাস্ত্র

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য, অধ্যয়ন দক্ষতা এবং শিখন ফলাফল

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG–৫ পরিবারে প্রচলিত বিষয়গুলি থেকে শুরু করে সমাজের/সামাজিক আঞ্চলিক/জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ধরনের অসমতা ও কুসংস্কার বোঝা এবং এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া।			
ক্র.	**অধ্যয়ন দক্ষতা**	**শিখন ফলাফল**	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
১	**আমাদের সামাজিক জীবন** C–৫.২ : সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে করা প্রচেষ্টাগুলি চিহ্নিত করা, ব্যাখ্যা করা এবং সেই ভিত্তিতে সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে ব্যক্তি কী করতে পারে তা অধ্যয়ন করা।	১. সমাজের ধারণা ব্যাখ্যা করে। ২. পরিবারের গুরুত্ব বলে। ক) আত্মীয়তার গুরুত্ব বলে। খ) সামাজিক রীতিনীতির বর্ণনা করে।	৮৭,৯৩ ৮৮, ৯৩ ৮৮ ৯০,৯১
		৩. মানব জীবনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবদান ব্যাখ্যা করে। ৪. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বলে। ৫. বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান - এটি বলে।	৮৯, ৯৩ ৮৯ ৮৯
		৬. সামাজিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য বলে। ক) ধর্মীয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য বলে। খ) ভাষাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য বলে।	৯০, ৯২, ৯৩ ৯০, ৯২ ৯০, ৯২, ৯৩
		৭. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বলে।	৯১, ৯২
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG–৮ ভারতীয় সংবিধানের বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝে ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্থাপনে সংবিধানের গুরুত্ব জানা।			
২	**ভারতীয় সংবিধান** C– ৮.১ গত কয়েক দশকে, যে কোনো দেশের বিশেষত ভারতের সংবিধানের প্রয়োজন কেন হয় এবং সংবিধানের গভীর উদ্দেশ্য কী তা জানে। C–৮.২ ভারতীয় সংবিধান নির্মাণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। তাতে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ, তেমনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা থেকে আসা সভ্যতা বোঝে।	১. সংবিধানের অর্থ বলে। ২. সংবিধানের প্রকার বলে। ৩. ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে।	৯৫, ৯৯ ৯৫ ৯৫, ৯৯
		৪. ভারতীয় সংবিধান নির্মাণের পটভূমি বলে।	৯৫,৯৬, ৯৯
		৫. সংবিধান সভা সম্পর্কে তথ্য বলে। ৬. মুসাবিদা কমিটি সম্পর্কে তথ্য বলে।	৯৬,৯৭,৯৮, ৯৯ ৯৭,৯৮, ৯৯
৩	**ভারতীয় সংবিধানের বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝে** C– ৮.১ ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্থাপনে সংবিধানের গুরুত্ব জানা। C– ৮.২ ভারতীয় সংবিধান নির্মাণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। তাতে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ, তেমনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা থেকে আসা সভ্যতা বোঝে।	৭. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে। ক) ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলি বলে। ৮. ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি বলে।	১০০, ১০২ ১০১,১০২, ১০৩ ১০১, ১০৩
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG–৮ ভারতীয় সংবিধানের বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝে ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্থাপনে সংবিধানের গুরুত্ব জানা।			
৪	**গ্রামীণ স্থানীয় শাসন সংস্থা** C– ৮.৩ স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার বিস্তৃত কার্যাবলির ব্যাখ্যা দেয় এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে এর গুরুত্ব বলে ও উৎসাহিত করে।	১. স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার বিস্তৃত কাঠামো বলে। ২. গ্রামপঞ্চায়েতের তথ্য বলে। ক) গ্রামপঞ্চায়েতের গঠন বলে। খ) গ্রামপঞ্চায়েতের কার্য বলে। গ) গ্রামপঞ্চায়েত প্রশাসনের তথ্য বলে। ঘ) গ্রামসভা সম্পর্কে তথ্য বলে।	১০৪, ১১১ ১০৪,১০৫ ১০৪,১০৫, ১১১ ১০৫, ১১১ ১০৬, ১১০, ১১১ ১০৬,১০৭

		৭. পঞ্চায়েত সমিতির গঠন ব্যাখ্যা করে।	১০৮
		ক) পঞ্চায়েত সমিতির কার্য ব্যাখ্যা করে।	১০৮
		খ) পঞ্চায়েত সমিতির প্রশাসন সম্পর্কে তথ্য বলে।	১০৮, ১১০, ১১১
		৪. জেলা পরিষদের গঠন ব্যাখ্যা করে।	১০৯
		ক) জেলা পরিষদের কার্যাবলি বলে।	১০৯
		খ) জেলা পরিষদের প্রশাসন সম্পর্কে তথ্য বলে।	১০৯, ১১০, ১১১
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG-৮ ভারতীয় সংবিধানের বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝে ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্থাপনে সংবিধানের গুরুত্ব জানা।			
৫	**শহুরে স্থানীয় শাসন সংস্থা** C- ৮.৩ স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার ত্রিস্তরীয়কার্যাবলির ব্যাখ্যা দেয় এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে এর গুরুত্ব বলে ও উৎসাহিত করে।	১. নগরপঞ্চায়েতের গঠন বলে।	১১২, ১১৯, ১২০
		২. নগরপঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি বলে।	১১৩
		৩. পৌরসভার গঠন বলে।	১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯
		ক) পৌরপ্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া বলে।	১১৪
		৪. পৌরসভার কাজ বলে।	১১৩, ১১৪, ১১৯
		ক) পৌরসভার বাধ্যতামূলক কাজ বলে।	১১৩, ১১৪
		খ) পৌরসভার ঐচ্ছিক কাজ বলে।	১১৪
		৫. পৌরসভার আয়ের উৎস বলে।	১১৫
		৬. মহানগরপালিকার গঠন বলে।	১১৫, ১১৬, ১১৯
		ক) মহানগরপালিকারকার্যাবলি বলে।	১১৬, ১১৯, ১২০
		খ) মহানগরপালিকার বিভিন্ন বিষয় কমিটির তথ্য বলে।	১১৬, ১১৭
		গ) মহানগরপালিকার প্রশাসন ব্যবস্থা বলে।	১১৬, ১২০
		ঘ) মহানগরপালিকার আয়ের উৎস বলে।	১১৭
		৭. ছাউনি বোর্ডের (ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড) অর্থ বলে।	১১৭
		ক) ছাউনি বোর্ডের গঠন বলে।	১১৮
		খ) ছাউনি বোর্ডের বৈশিষ্ট্য বলে।	১১৮
		গ) ছাউনি বোর্ডের কার্য বলে।	১১৮,১১৯
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য CG-৮ ভারতীয় সংবিধানের বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝে ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্থাপনে সংবিধানের গুরুত্ব জানা।			
৬	**জেলা প্রশাসন** C- ৮.৩ স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার ত্রিস্তরীয় কার্যাবলির ব্যাখ্যা দেয় এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে এর গুরুত্ব বলে ও উৎসাহিত করে।	১. জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের নাম বলে।	১২১
		২. জেলা রাজস্ব প্রশাসনের গঠন ব্যাখ্যা করে।	১২১,১২২
		ক) জেলা রাজস্ব প্রশাসনের কার্যাবলির বর্ণনা করে।	১২২, ১২৬, ১২৭
		খ) জেলা রাজস্ব প্রশাসনের ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য বলে।	১২১, ১২২, ১২৩, ১২৬
		৩. জেলা পুলিশ প্রশাসনের গঠন ব্যাখ্যা করে।	১২৪
		ক) জেলা পুলিশ প্রশাসনের কার্যাবলির বর্ণনা করে।	১২৪, ১২৭
		৪. জেলা বিচার প্রশাসনের গঠন ব্যাখ্যা করে।	১২৫, ১২৬
		ক) জেলা বিচার প্রশাসনের কার্যাবলি বলে।	১২৫, ১২৬, ১২৭

টিকা : এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করা মানচিত্র শিক্ষাগত উদ্দেশ্য তৈরী করা হয়েছে। এটিকে রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না। মানিচত্র তৈরী করার সময় যথাসম্ভব নির্ভুল তৈরী করার চেষ্টা হয়েছে। তবুও কিছু ত্রুটি থাকলে সেটা প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে থাকতে পারে।

সূচীপত্র

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	আমাদের সামাজিক জীবন	৮৭
২	ভারতীয় সংবিধান	৯৪
৩	ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য	১০০
৪	স্থানীয় শাসন সংস্থা (গ্রামীণ)	১০৪
৫	স্থানীয় শাসন সংস্থা (শহরাঞ্চল)	১১২
৬	জেলা প্রশাসন	১২১

১ আমাদের সামাজিক জীবন

১.১ সমাজ : অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা	১.৩ সামাজিক বৈচিত্র্য
১.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কাজ	১.৪ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

মানুষের পরিবর্তন কীভাবে হয়েছে তা তোমরা আগে পড়েছ। আজকের আমাদের সামাজিক জীবন হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়েগড়ে উঠেছে। মানুষ যাযাবর অবস্থা থেকে স্থায়ী সমাজ-জীবনের দিকে এগিয়েএসেছে।

১.১ সমাজ: অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা

শুধু মানুষের দল মানেই সমাজ নয়, বরং সমূহে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্কের ব্যবস্থা থাকে, তাকেই সমাজ বলে। সমাজে বৃদ্ধ, প্রাপ্তবয়স্ক, তরুণ, ছোট ছেলেমেয়ে প্রতিটি মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

১.১.১ মানুষের সমাজের প্রয়োজন কেন হলো ?

যাযাবর অবস্থায়মানুষের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ছিল না। শারীরিক ও আবেগিক চাহিদা পূরণ করতে মানুষ একত্রিত হলো। একসঙ্গে থেকে সে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিস্থিতির আরও সক্ষমভাবে মোকাবিলা করতে শুরু করল। খাদ্য ও আশ্রয়পেতে মানুষ একসঙ্গে পরিশ্রম করতে লাগল। সামূহিকভাবে সবাই যদি পরিশ্রম করে, তাহলে সকলেই বেঁচে থাকা সহজ হয় এটা মানুষ বুঝল। এর থেকেই মানব সমাজ গঠনের সূচনা হলো।

১.১.২ মানুষের মধ্যে সামাজিকতা

মানুষ সমাজের অংশ হতে পেরে আনন্দ পায় সে একটি সামাজিক প্রাণী। আমরা সবাই একে অপরের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসি। মানুষ শুধু নিরাপত্তার জন্য বা শারীরিক ও বস্তুগত চাহিদা মেটাতে সমাজে বাস করে না, বরং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যও সে সমাজে থাকে। আনন্দ হলে কাউকে বলতে ইচ্ছে করে। দুঃখ হলে কেউ বুঝুক এমন মনে হয়। নতুন কোনো ভাবনা এলে প্রিয়জনদের জানাতে ইচ্ছে করে। এই ধরনের আবেগিক ও বৌদ্ধিক আদান-প্রদানের মধ্যেই আমাদের সামাজিকতা প্রকাশ পায়।

নীচের প্রথম তিনটি ছবি দেখে শেষ ছবিতে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর খোঁজো।

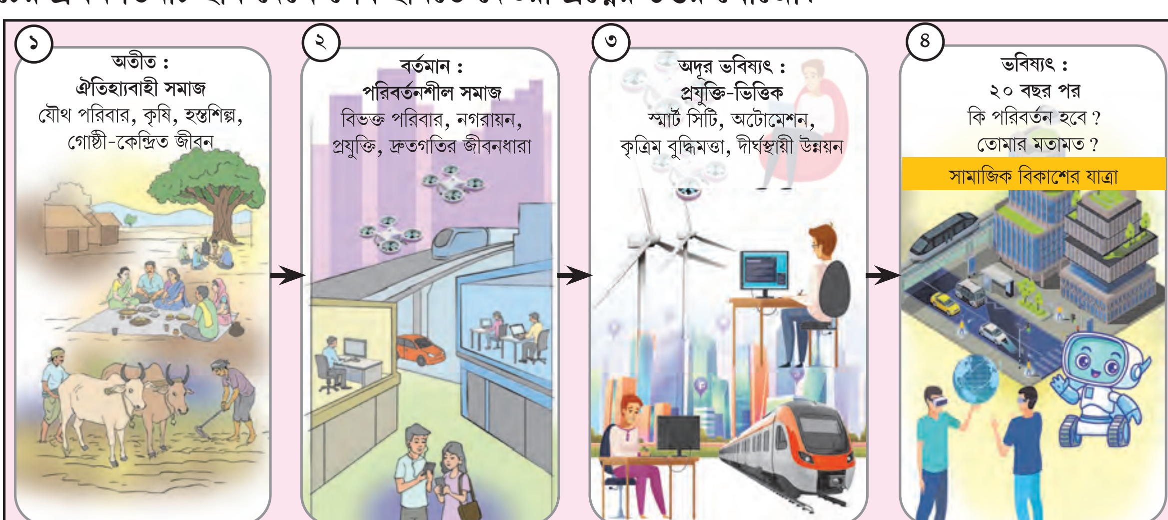

সামাজিকতা: সামাজিকতা বলতে বোঝায় ব্যক্তির অন্য মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সুসংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে আচরণ করার ক্ষমতা।

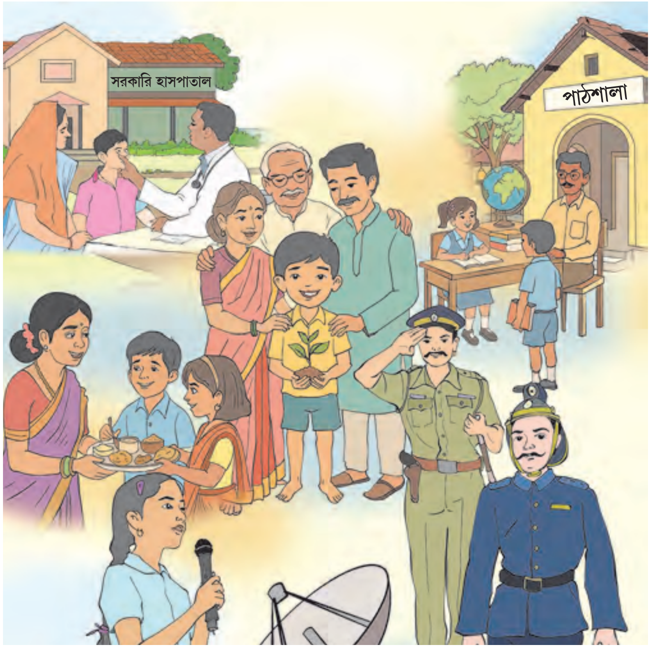

বিকাশ

১.১.৩ পরিবার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ

যৌথ পরিবার

ঠাকুরদা-ঠাকুরমা → বাবা-মা → সন্তান; ঠাকুরদা-ঠাকুরমা → কাকা-কাকীমা → সন্তান

একক পরিবার

বাবা-মা → সন্তান

মানুষের প্রাথমিক যুগে 'পরিবার' ধারণাটি আজকের মতো স্পষ্ট ছিল না। মানুষ দল বেঁধে থাকত। প্রকৃতির বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মানুষ একসঙ্গে থাকতে শুরু করায় তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি জন্ম নিল।

খাদ্যের চাহিদা মেটাতে মানুষ চাষ শুরু করল, এর ফলে তাদের জীবন স্থায়ী রূপ পেল। চাষের জন্য বেশি মানুষের প্রয়োজন হওয়ায় 'পরিবার পদ্ধতি' অস্তিত্বে এলো।

এসো করে দেখি।

তোমার পরিবারের একটি তালিকা তৈরি করো এবং পরিবারের কাজের বিভাজন দেখাও। তুমি নিজে বাড়িতে কী কী কাজ করো তার তালিকা তৈরি করো।

১.১.৪ সমাজে কাজের বিভাজন

সমাজের বিভিন্ন অংশের নির্দিষ্ট রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী নিয়ম ও আইন বিদ্যমান থাকে। দলের সবার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব ছিল না। সামূহিক ভাবে কাজের বিভাজন শুরু হলো এবং তার থেকে সমাজ গড়ে উঠল। এরপর সমাজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য নিয়ম তৈরি হলো।

পরিবার : যে সব ব্যক্তি রক্তসম্পর্ক, বিবাহ বা দত্তক সম্পর্কের কারণে একসঙ্গে সমূহে বাস করে এবং একে অপরের যত্ন নেয়, সেই দলকে পরিবার বলে।

ছোট পরিবার : পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৪-এর কম হলে সেটি ছোট পরিবার। (যেমন - মা, বাবা, ভাই, বোন)

বড় পরিবার : যে পরিবারে মা-বাবা-সন্তানদের সঙ্গে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, কাকা-কাকিমা ও তাদের সন্তানরা একসঙ্গে থাকে, তাকে বড় বা যৌথ পরিবার বলে।

১.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কাজ

পরিবার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ধর্মীয় সংগঠন ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। এদের মূল কাজ হলো মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণ করা। সমাজকে ভালো মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া এবং আবেগিক সহায়তার পাশাপাশি সমাজে শৃঙ্খলা বজায়রাখা এটাই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ।

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে। এই চিন্তার ক্ষমতা বিকশিত হতে পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তেমনি রেডিও, সংবাদপত্র, দূরদর্শন (টি.ভি.), চলচ্চিত্র, নাটক, ইন্টারনেট, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয়প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা বিকশিত হয়। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এই ক্ষমতা থেকে ব্যক্তি ব্যক্তিতে বিভিন্ন পছন্দ-অপছন্দ তৈরি হয়।

একই গ্রামে বা শহরের একটি এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিভা ও দক্ষতা গড়ে ওঠে। এই প্রতিভা ও দক্ষতার ভিত্তিতে একই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে।

বিদ্যালয় : একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান

সমাজের তৈরি একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো বিদ্যালয়। শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয়, প্রতিভার বিকাশ, দলগত মনোভাব ইত্যাদি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমরা শিখি। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক চাহিদার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতু হলো বিদ্যালয়।

এসো করে দেখি।

১) তোমার বন্ধুবান্ধবদের কোন কোন প্রতিভায়আগ্রহ আছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

২) তোমার বন্ধুবান্ধবরা বড় হয়ে কী হতে চায়তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং একটি তালিকা তৈরি করো।

১.২.১ সমাজে পারস্পরিক নির্ভরতা

খাদ্য ও আশ্রয়ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা। পরিবারে বসবাসকারী মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন হলো। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা এগুলি পূরণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব সমাজের। উদাহরণ স্বরূপ -

১) খাদ্যের চাহিদা মেটাতে চাষ করা।

২) চাষ করতে সরঞ্জাম ও পশু সরবরাহ করা।

৩) বীজ সরবরাহ করা।

সমাজ : বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী, নিজস্ব আচরণবিধি ও জীবনদৃষ্টি সম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর সমষ্টিকে সমাজ বলে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান: ✻ মৌলিক সামাজিক কার্য পূরণের জন্য মানুষের আচরণের সংগঠিত রূপকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে।
✻ বিবাহ প্রতিষ্ঠান, জাতিপ্রথা, পরিবার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কিছু উদাহরণ।

সমাজের উপাদান : ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এগুলি সবই সমাজের উপাদান।

৪) কৃষিপণ্য করণের প্রক্রিয়া শিল্প গড়ে তোলা।

৫) এই সব বিষয়ের চাহিদা পূরণের জন্য আর্থিক সুবিধা (যেমন - সমবায়বা ব্যাংক থেকে ঋণ) সরবরাহ করা।

এই ধরনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা সমাজে গড়ে তুলতে হয়। সমাজের মানুষের মেধা থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিসেবার সৃষ্টি হয়। সমাজের মানুষের প্রতিভা থেকে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আসে এবং বিনোদনের উপায়তৈরি হয়। সমাজের মানুষের ব্যবসায়িক দক্ষতা ও উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। বস্তুগত চাহিদা পূরণের জন্য এবং মানসিক ও আবেগিক চাহিদা পূরণের জন্যও সমাজের সব মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এটিকেই সমাজে 'ব্যক্তির পারস্পরিক নির্ভরতা' বলে।

১.৩ সামাজিক বৈচিত্র্য

ভারতীয় সমাজে অনেক ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে। এই বৈচিত্র্য ভারতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ভারতের প্রকৃত শক্তি।

১.৩.১ ধর্মীয় বৈচিত্র্য

ভারতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ এবং পারসি এইসব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বাস করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী উৎসব পালন করার স্বাধীনতা পায়। এতে সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতি তৈরি হয়।

১.৩.২ ভাষিক বৈচিত্র্য

সমাজের কারণে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ গুণ ও সক্ষমতা বিকশিত হয়। একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে আমরা ভাষা শিখি। সেই ভাষা আমাদের জন্মের সময়থেকে জানা থাকে না। আমরা সেটা বাড়িতে, পাড়ায়ও বিদ্যালয়েশিখি। বিদ্যালয়েতো বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ পাই।

মারাঠি, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, কন্নড়, তেলুগু, তামিল, বাংলা, সিন্ধি এইসব ভাষায়কথা বলা মানুষ আমাদের চারপাশে থাকে। তেমনি অহিরাণী, কোঙ্কণি, বন্‌হাড়ি-র মতো আঞ্চলিক ভাষা এবং গোন্ডি, ভিল্লি, সাঁওতালির মতো আদিবাসী ভাষার কারণে ভাষাগত ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়।

সমাজে পারস্পরিক নির্ভরতা	:	সমাজের মানুষ একে অপরের চাহিদা পূরণের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকে। এই অবস্থাকে সমাজে পারস্পরিক নির্ভরতা বলে।
সামাজিক বৈচিত্র্য	:	সামাজিক বৈচিত্র্য বলতে সমাজে দেখা যাওয়া ভাষা, ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পোশাক, মতাদর্শ ইত্যাদিতে পার্থক্যকে বোঝায়।
ধর্মীয় বৈচিত্র্য	:	একটি সমাজে বা দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করাকে ধর্মীয় বৈচিত্র্য বলে।

বলো তো দেখি!

তোমার এলাকায় কোন কোন ভাষায়কথা বলা হয় ?

১.৪ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

মানব সমাজজীবনের বিকাশ হয়েছে কলা, ভাষা, পোশাক, খাদ্য, ঐতিহ্য, খেলাধুলা ইত্যাদির আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ভারত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রতিটি অঞ্চলের উৎসব, গান ও রীতিনীতি আলাদা। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের পেছনে প্রেরণা ও আস্থা এক হওয়ায় সম্পূর্ণ দেশ ঐক্যের সুতোয়গাঁথা।

খুঁজে দেখো।

মহারাষ্ট্রে জানুয়ারি মাসে মকরসংক্রান্তির উৎসব পালিত হয়। তেমনি, বিভিন্ন অঞ্চলে জানুয়ারি মাসে সূর্যের সংক্রমণ উদযাপনকারী উৎসবগুলো কোন কোন নামে পরিচিত ?

১.৪.১ খাদ্য বৈচিত্র্য

ভৌগোলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কৃষিজ উৎপাদন পরিবর্তিত হয় এবং সেই অনুযায়ী দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসও অঞ্চলভেদে বদলায়। মহারাষ্ট্রে সুস্বাদু হিসেবে খাওয়া পিঠলা-ভাকরি অন্য অঞ্চলে খুব কমই পাওয়া যায়।

- **তেল:** ভারতের দক্ষিণে নারকেল তেল, উত্তরে সরষের তেল এবং পশ্চিমে চিনাবাদামের তেল ব্যবহার হয়।
- **প্রধান খাদ্য:** ভারতের দক্ষিণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে 'ভাত', আর উত্তর ও মধ্য ভারতে 'গম', 'বাজরা, জোয়ার' ও 'ভুট্টা' প্রধান খাদ্য।
- **ঐক্য:** ইডলি-ডোসা এবং সমোসা-পরোটার মতো খাবার আজ সারা দেশে জনপ্রিয়, যা বৈচিত্র্যের মধ্যে 'ঐক্য' প্রকাশ করে।

খুঁজে দেখো।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় মিষ্টান্নের তালিকা তৈরি করো।
(উদাহরণ স্বরূপ, মহারাষ্ট্র পুরণপোলি)

ভারতের খাদ্য বৈচিত্র্য

ভাষিক বৈচিত্র্য	:	ভাষিক বৈচিত্র্য মানে একটি দেশে, রাজ্যে বা সমাজে বিভিন্ন ভাষা, উপভাষা ও লিপির অস্তিত্বকে ভাষিক বৈচিত্র্য বলে।
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	:	বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, উৎসব এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতির অস্তিত্বকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বলে।

খুঁজে দেখো।

রাজ্য	ভাষা	নৃত্যের ধরন	খেলা
মহারাষ্ট্র	মারাঠি	লাবণী	কবাতি
গুজরাট			
রাজস্থান			
পঞ্জাব			
হরিয়ানা			
উত্তরপ্রদেশ			
পশ্চিমবঙ্গ			
ওড়িশা			
আসাম			
কর্ণাটক			
মধ্যপ্রদেশ			
কেরল			
তামিলনাড়ু			
ছত্তিসগড়			

১.৪.২ বৈচিত্র্যই ভারতের পরিচয়ও শক্তি

ভারতীয় সমাজে ভাষা, সংস্কৃতি, আহারের অভ্যাসে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যই ভারতের প্রকৃত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি এবং একে অপরের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে সম্মান জানানোর ফলে বিশাল ভৌগোলিক বিস্তার ও বিপুল জনসংখ্যা সত্ত্বেও সর্বত্র ভারতীয়ত্বের অনুভূতি পাওয়া যায়। পরস্পরের জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে বোঝার ফলে সব জীবনধারা ও সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা পরস্পরের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতার ভাবনা থেকে সামাজিক ঐক্য তৈরি হয়। সময়ে-সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে এই সামাজিক ঐক্যের অনুভূতিতে একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ভারতের বৈচিত্র্যকে ধারণ করার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে।

অনুশীলনী

প্র. ১ চিহ্নিত করো এবং লেখো।

১. খাদ্যের চাহিদা মেটাতে মানুষ এই কাজকর্ম শুরু করেছিল -----------।

২. ব্যক্তি রক্ত সম্পর্ক, বিবাহ বা দত্তক সম্পর্কের কারণে একসঙ্গে থাকে ও একে অপরের যত্ন নেয় সেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান -----------।

৩. ভারতের দক্ষিণ উপকূলের প্রধান খাদ্য -----------।

প্র. ২ তালিকা তৈরি করো।

তোমার জানা অন্তত ৫টি ভাষার তালিকা তৈরি করো।

প্র. ৩ নীচের ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করো।

১. সমাজ

২. পরিবার প্রতিষ্ঠান

প্র. ৪ সমাজে নীতিনিয়ম ও আইনের প্রয়োজন কেন তোমার ভাষায় লেখো।

প্র. ৫ ধারণাচিত্র সম্পূর্ণ করো।

প্র. ৬ এসো নিজেকে যাচাই করে দেখি।

তুমি কি 'আদর্শ নাগরিক' ?

নীচের প্রশ্নগুলোর পাশে (✓) বা (✗) চিহ্ন দাও।

১. আমি আবর্জনা বর্জ্যপাত্রে ফেলি। [ ]

২. আমি লাইনে দাঁড়াই, ধাক্কাধাক্কি করি না। [ ]

৩. আমি জল নষ্ট করি না। [ ]

৪. আমি প্রতিবেশী ও বয়স্ক মানুষদের সাহায্য করি। [ ]

৫. আমি পার্কের ফুল ছিঁড়ি না। [ ]

উপক্রম :

- ভারতের বিভিন্ন রাজ্য অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য, উৎসব ও নৃত্যের বৈচিত্র্য দেখানো একটি তালিকা তৈরি করো এবং শ্রেণীকক্ষে লাগাও।
- ভারতের মানচিত্রে সব রাজ্যগুলো বিভিন্ন রঙে রঙিন করো এবং সেখানে বিখ্যাত একটি বিষয়ের নাম লেখো।
- 'বিদ্যালয়' সবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এটি ব্যাখ্যা করে একটি ছবির তালিকা শিক্ষকের সাহায্যে তৈরি করো।

***

২ ভারতীয় সংবিধান

২.১ সংবিধানের অর্থ, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
২.২ ভারতীয় সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া
২.৩ গণপরিষদের কার্যক্রম

সমতা : তুমি কি জানো? স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের জাতীয় উৎসব।

আমন : হ্যাঁ, স্বাধীনতা দিবসে, অর্থাৎ ১৫ আগস্টে এবং প্রজাতন্ত্র দিবসে, অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারিতে আমাদের বিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন হয় এবং নানা অনুষ্ঠানও হয়। এই দুটো দিনে কী আনন্দ ও উৎসাহের পরিবেশই না থাকে!

মেরি : ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল। আমরা ব্রিটিশদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। তাই প্রতি বছর আমরা ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করি।

সমতা : কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবস আসলে কী?

আমন : ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে ভারত দেশ কে পরিচালনার জন্য তৈরি করা সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। তাই প্রতি বছর আমরা ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি।

মেরি : কিন্তু এই দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস কেন বলে? সংবিধান আবার কী? এটা কে তৈরি করেছিল এবং সংবিধানের দরকার কেন হয়? ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালের এই দিনটিতেই সংবিধান কার্যকর হয়েছিল কেন?

ভারতীয় সংবিধান নিয়েমেরির মনে যে প্রশ্ন ও কৌতূহল জেগেছে, সেই একই প্রশ্ন তোমাদের মনেও নিশ্চয়ই আছে। চলো তাহলে এই অধ্যায়ের মাধ্যমে জেনে নেওয়া যাক।

আগের অধ্যায়ে আমরা সমাজ সম্পর্কে পড়েছিলাম। সমাজের বিভিন্ন অংশ যাতে মিলেমিশে একসাথে থাকতে পারে এবং সবার কাছে উন্নতির সমান সুযোগ থাকে, সেজন্য আইন ও নিয়মের দরকার হয়। সমাজ পরিচালনার জন্য প্রায় সব দেশই নিজ নিজ সংবিধান তৈরি করেছে। আমাদের ভারতবর্ষের রাষ্ট্র পরিচালনা আমাদের 'সংবিধান' অনুযায়ী চলে।

ভেবে দেখো।

মাঠে খেলা ক্রিকেট ম্যাচ এবং রাস্তায়খেলা ক্রিকেট ম্যাচের মধ্যে কী পার্থক্য আছে, তা নীচের দেওয়া বিষয়গুলোর ভিত্তিতে বলো এবং নিয়মের কী গুরুত্ব আছে তা বলো।

(১) নিয়ম　　(২) সীমারেখা
(৩) নিরাপত্তা　　(৪) আম্পায়ার

মাঠে খেলা ম্যাচে সংগঠনতা, আনুষ্ঠানিকতা এবং লিখিত নিয়ম মানা হয়। কিন্তু রাস্তায়খেলা ম্যাচে কোনো নিয়ম থাকে না, সংগঠতা থাকে না বা সেগুলো মানা হয় না এবং কোনো সরকারি আম্পায়ারও থাকে না। ঠিক এইভাবেই দেশ সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে হলে রাজ্যঘটনা (সংবিধান) অপরিহার্য। সংবিধান না থাকলে দেশের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলবে না।

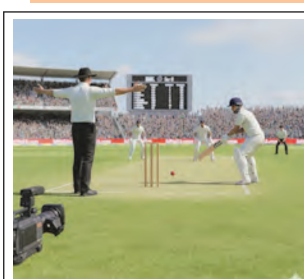

২.১ সংবিধানের অর্থ, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

যেকোনো দেশের সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তৈরি করা মৌলিক আইন, নিয়ম ও বিধান গুলিকে একত্রে 'সংবিধান' বলে। সংবিধানকে 'রাজ্যঘটনা' ও বলা হয়।

সংবিধানের প্রয়োজনীয়তার প্রধান কারণগুলি নিম্ন রূপ:

১. নিয়মের কাঠামো ও শৃঙ্খলা : সংবিধান হলো দেশের আইনের সর্বোচ্চ উৎস। সমাজে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও মতের মানুষ একসাথে বাস করে। তাদের মধ্যে সমন্বয় রাখতে এবং দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে, সেজন্য কিছু মৌলিক নিয়মের প্রয়োজন হয়। সংবিধান এই নিয়মাবলি প্রদান করে।

২. শাসনের ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা : সংবিধান না থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। সংবিধান সরকারের ক্ষমতা স্পষ্ট করে এবং তার উপর সীমাবদ্ধতা নিশ্চিত করে।

৩. নাগরিকদের অধিকার রক্ষা : সংবিধান নাগরিকদের কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করে এবং তা রক্ষা করে। (যেমন - বাক্ স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা)

৪. ক্ষমতার বিভাজন : সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভাগ করা হয়।

- **আইনসভা :** যে অংশ আইন তৈরি করে তাকে 'আইনসভা' বলে।
- **শাসনবিভাগ :** যে অংশ আইনের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করে তাকে 'শাসনবিভাগ' বলে।
- **বিচারবিভাগ:** যে অংশ আইনের ব্যাখ্যা করে এবং বিচার প্রদান করে তাকে 'বিচারবিভাগ' বলে।

৫. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা : গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে সম্মান দেওয়া হয়, কিন্তু সংবিধানের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের উপর অন্যায় করতে পারে না। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব সংবিধানের।

৬. দেশের লক্ষ্য ও মূল্যবোধ স্পষ্ট করা : দেশকে কোন দিকে নিয়েযেতে হবে, তা সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' থেকে স্পষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ভারত ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সংবিধান হলো দেশের 'আত্মা', যা ভারতের মতো দেশে গণতন্ত্রকে জীবন্ত রাখার কাজ করে।

করে দেখো।

তোমাদের শ্রেণীকক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়-রাখার জন্য একটি নিয়মাবলি তৈরি করো।

২.১.১ সংবিধানের প্রকারভেদ

সাধারণত সংবিধান দুই প্রকার লিখিত ও অলিখিত।

লিখিত : দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মৌলিক নিয়ম, আইন ও নীতি যখন একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট লিখিত দলিলে সুশৃঙ্খল ভাবে সংকলিত করা থাকে, তাকে 'লিখিত সংবিধান' বলে। যেমন - ভারত, আমেরিকা।

অলিখিত : যে দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, কোনো নির্দিষ্ট গণপরিষদ একসাথে বসে লেখেনি, তাকে 'অলিখিত সংবিধান' বলে। যেমন - ব্রিটেন (যুক্তরাজ্য)।

এসো খুঁজি এবং আলোচনা করো।

শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দুটো দলে ভাগ করো। লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধানের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে দলগত আলোচনা করো।

২.২ ভারতীয় সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া

ভারতের ভৌগোলিক বিশালতা, বিশাল জন-সংখ্যা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রাখলে সংবিধান ছাড়া দেশ পরিচালনা কঠিন ব্যাপার।

দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান অপরিহার্য।

আমাদের দেশ স্বাধীনতা পাবে এটা নিশ্চিত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এজন্য গণপরিষদ (Constituent Assembly) স্থাপন করা হয়।

‘স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা ব্রিটিশদের তৈরি আইন অনুযায়ী নয়, বরং ভারতীয়রা নিজেরা তৈরি করা আইন অনুযায়ী চলবে’, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা এই দাবিতে অটল ছিলেন।

তোমরা জানো কী ?

দেশের বিভিন্ন প্রদেশের (সেই সময় মুম্বাই প্রদেশ, বাংলা প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশ ইত্যাদি বিভাগ ছিল) পরিচালনার জন্য ১৯৪৬ সালে জন প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়েছিল। প্রতিটি প্রদেশের জনপ্রতিনিধিরা তাদের মধ্য থেকে কিছু প্রতিনিধিকে গণপরিষদের কাজে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। এর পাশাপাশি, সেই সময়দেশে বিভিন্ন রাজার রাজ্য ছিল। এই রাজারা গণপরিষদের কাজে অংশগ্রহণের জন্য তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এভাবে প্রদেশ ও রাজ্যগুলির মোট ২৯৯ জন সদস্য গণপরিষদে ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু মহিলা সদস্যও ছিলেন।

এসো জেনে নিই।

গণপরিষদের সদস্যরা দুই প্রকারের ছিলেন:

১. প্রদেশগুলির আইনসভা থেকে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা – ২২৯

২. রাজাদের মনোনীত সদস্যের সংখ্যা – ৭০

খুঁজে দেখো।

১৯২৮ সালে আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতের হকি দল ভারতকে প্রথম অলিম্পিক স্বর্ণপদক জিতিয়ে দিয়েছিল। এই হকি দলের অধিনায়ক পরবর্তীকালে ভারতের গণপরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর নাম কী ছিল খুঁজে দেখো।

২.৩ গণপরিষদের কার্য

স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরির জন্য গণপরিষদ স্থাপন করা হয়। গণপরিষদের প্রথম বৈঠক ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ড. সচ্চিদানন্দ সিনহাকে পরিষদের অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

ড. সচ্চিদানন্দ সিনহা

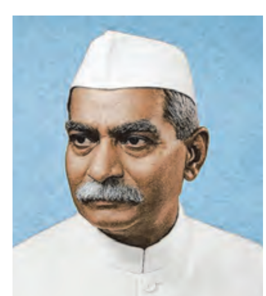
ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ

বি.এন. রাউকে গণপরিষদের আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

গণপরিষদের কার্যক্রমে সুসংগতি আনার জন্য মোট ২২টি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

গণপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সমিতিগুলি

সমিতির নাম	সমিতির প্রধান
গণপরিষদ নিয়ম সমিতি (পরিচালনা কমিটি)	ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ
মসুদা সমিতি	ড. বাবাসাহেব আম্বেডকর
যুক্তরাষ্ট্রীয় সমিতি	পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
মৌলিক অধিকার ও সংখ্যালঘু সমিতি	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

এই ও অন্যান্য সব কমিটির পেশ করা রিপোর্টগুলি একত্রে বিবেচনা করে সংবিধানের মসুদা তৈরির জন্য মসুদা কমিটি গঠন করা হয়।

২.৩.১ মসুদা কমিটি

মসুদা কমিটি ছিল ভারতীয় সংবিধান রচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। এই কমিটি ২৯ আগস্ট ১৯৪৭ সালে গঠিত হয়। মসুদা কমিটি বিভিন্ন কমিটির কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করে সংবিধানকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার একটি প্রকৃত মসুদা তৈরি করেছিল। এই কমিটির তৈরি চূড়ান্ত মসুদা **২৬ নভেম্বর ১৯৪৯** সালে গণপরিষদ গ্রহণ করে।

মসুদা কমিটির সদস্যরা :

মসুদা কমিটিতে সভাপতি-সহ মোট সাত জন সদস্য ছিলেন :

১. ড. বি. আর. আম্বেডকর (সভাপতি)

২. শ্রী এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার

৩. শ্রী অল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার

৪. ড. কে. এম. মুন্সি

৫. শ্রী মহম্মদ সাদুল্লা

৬. শ্রী বি. এল. মিত্তর (তাঁর পদত্যাগের পর কে. এন. মাধবরাও নিযুক্ত হন।)

৭. শ্রী ডি. পি. খেতান (তাঁর মৃত্যুর পর শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারি নিযুক্ত হন।)

তোমরা জানো কী ?

ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশদের কাছে সম্পূর্ণ স্বরাজের দাবি জানিয়েছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২৬ জানুয়ারি ১৯৩০ সালে সারা দেশে প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হয়েছিল। ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক দিনটির গুরুত্ব ও স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখতে ‘২৬ জানুয়ারি ১৯৫০’ সালে সংবিধান কার্যকর করা হয়েছিল। সেজন্যই এই দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়।

ড. বাবাসাহেব আম্বেডকরের মসুদা কমিটিতে অবদান

ভারতীয় সংবিধানের মসুদা গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে পেশ করছেন ড. বাবাসাহেব আম্বেডকর।

ড. বাবাসাহেব আম্বেডকর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছিলেন। এর পাশাপাশি গণপরিষদের সব কমিটির রিপোর্টগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে মসুদা তৈরি করেছিলেন এবং গণপরিষদে পেশ করেছিলেন।

এই মসুদার প্রতিটি বিধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার সময় গণপরিষদের

সদস্যদের প্রশ্ন ও সংশয়ের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব ড. বাবাসাহেব আম্বেডকর দক্ষতার সাথে পালন করেছিলেন। গণপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী সংবিধানের মসুদায় সংশোধন করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন এবং সংবিধানের চূড়ান্ত মসুদা তৈরি করেছিলেন। তাঁর এই অতুলনীয় অবদানের জন্য তাঁকে **'ভারতীয় সংবিধানের শিল্পকার'** বলা হয়।

বিজয়ালক্ষ্মী পণ্ডিত	সরোজিনী নাইডু	অম্মু স্বামীনাথন
রেণুকা রে	অ্যানি মাস্কারিন	সুচেতা কৃপলানি
দাক্ষায়নী বেলায়ুধন	হংসা মেহতা	বেগম এজাজ রসুল
মালতী চৌধুরী	লীলা রায়	রাজকুমারী অমৃত কৌর
দুর্গাবাই দেশমুখ	পূর্ণিমা ব্যানার্জি	কমলা চৌধুরী

গণপরিষদের সমস্ত মহিলা সদস্য

তোমরা জানো কী ?

১) মসুদা সমিতি দ্বারা তৈরী করা সংবিধানের প্রথম মসুদা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত করে তার উপর চর্চা করা হয়েছিল।

২) গণপরিষদে বিভিন্ন বিষয়েআলোচনা হয়েছিল। অধিকাংশ বিধানের উপর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

৩) গণপরিষদের কার্যক্রম ২ বছর, ১১ মাস ও ১৮ দিন চলেছিল। (৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ থেকে ২৫ নভেম্বর ১৯৪৯ পর্যন্ত)

৪) গণপরিষদের কার্যকালে ৫৩,০০০ মানুষ দর্শক গ্যালারিতে বসে গণপরিষদের কার্যক্রম সরাসরি দেখেছিলেন।

৫) গণপরিষদের সদস্যরা সংবিধানের প্রতিলিপিতে ২৪ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে স্বাক্ষর করেছিলেন।

৬) মূল সংবিধানে প্রস্তাবনা, ২২টি অধ্যায়, ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি তফসিল ছিল।

৭) ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে গণপরিষদ সম্পূর্ণ সংবিধান গ্রহণ করেছিল। সেজন্য ২৬ নভেম্বর দিনটি সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হয়।

৮) সংবিধান কার্যকর করার জন্য ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখটি নির্ধারিত হয়েছিল। সেজন্য এই দিনটি আমরা 'প্রজাতন্ত্র দিবস' হিসেবে পালন করি।

৯) সংবিধান কার্য়কর হওয়ার পর ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ থেকে ১৯৫২২ পর্যন্ত প্রথম সার্বজনিক নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত সংবিধান সভা ভারতের "কার্যবাহী সংসদ" বলে কাজ করেছিল।

এসো জেনে নিই।

- সংবিধানের মূল ইংরেজি পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন– **প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা**

- সংবিধানের মূল হিন্দি পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন – **বসন্ত কৃষ্ণ বৈদ্য**

- দুটী সংবিধানের সাজসজ্জা করবেন দ্বারা - **আচার্য নন্দলাল বোস**

অনুশীলনী

প্র. ১ বলো দেখি।

১. আইন তৈরি করে যে সভা

----

২. গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি

----

৩. ভারতীয় সংবিধানের শিল্পকার

প্র. ২ নীচের সারণী পূর্ণ করো।

কমিটির প্রধান	**কমিটির নাম**
---------------------- ----------------------	যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিটি
ড. বাবাসাহেব আম্বেডকর	---------------------- ----------------------
---------------------- ----------------------	কমিটি
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	---------------------- ----------------------

প্র. ৩ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

১. সংবিধান

২. মসুদা কমিটি

প্র. ৪ প্রতিটি দেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা কেন আছে সে বিষয়ে তোমার মত লেখো।

প্র. ৫ তুমি কী করবে ?

'সাধারণতঃ ছেলেদের করার কাজ এবং মেয়েদের করার কাজের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।' সংবিধানের সমতার মূল্যবোধ বোঝানোর জন্য তুমি কী করবে ?

তোমার কাজ

উপক্রম

১. শ্রেণীর শ্রেণীপ্রধান (মনিটর) নির্বাচনের জন্য প্রকৃত নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করো।

২. খাতায় মৌলিক অধিকার ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট তোমার কর্তব্যের একটি ছক তৈরি করো।

***

৩ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য

৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্বরূপ
৩.৭ ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য
৩.৪ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

সংবিধান সভায় উদ্দেশ্য প্রস্তাব উপস্থাপন করছেন - পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সংবিধান সভার সামনে উদ্দেশ্য প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পরবর্তীকালে সেই প্রস্তাব থেকেই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা গড়ে ওঠে।

৩.১ প্রস্তাবনা

ভারতীয়সংবিধানের ভূমিকা অংশকে ‘প্রস্তাবনা’ বা ‘উদ্দেশিকা’ বা ‘সরনামাও’ বলা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে সংবিধানের মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। তাই প্রস্তাবনা হলো ‘সংবিধান বোঝার আত্মা’।

করে দেখো।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি স্বহস্তে লেখো।

ভারতের সংবিধান ভারতের জনগণের দ্বারা রচিত এবং স্বেচ্ছায়গৃহীত। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩.২ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্বরূপ

সার্বভৌম : যে দেশের উপর কোনো বাহ্যিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই এবং যে দেশ নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সেই দেশকে সার্বভৌম বলা হয়। ভারতের নিজস্ব আইন প্রণয়ন ও বিদেশনীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ অধিকার রয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক : দেশের সম্পদ সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্মিত এবং তার উপর রাষ্ট্রের মালিকানা বিদ্যমান এই ব্যবস্থাকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে। সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন না করে সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করাই এর উদ্দেশ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ : ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রের (দেশের) নিজস্ব কোনো সরকারি ধর্ম নেই। সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় এবং প্রতিটি নাগরিক নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মপালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

গণতান্ত্রিক : গণতন্ত্র অর্থাৎ ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ এবং তারা নিজেরাই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এই পরিচয়েই এই ব্যবস্থা পরিচিত।

প্রজাতান্ত্রিক : প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ দেশের সমস্ত সর্বজনীন পদ (যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী) বংশানুক্রমে কারো কাছে যায়না। এই পদগুলি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে থাকে।

৩.৩ ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে গড়ে উঠা ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ভারত গঠনের উদ্দেশ্য সংবিধান গ্রহণ করেছে।

১. ন্যায় :কাউকে জাতি, ধর্ম, বংশ, লিঙ্গ, ভাষার ভিত্তিতে বৈষম্য না করে সকলকে উন্নতির সমান সুযোগ দেওয়াই হলো ন্যায়। এতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় অন্তর্ভুক্ত।

২. স্বাধীনতা :নাগরিকদের উপর কোনো অনুচিত বিধিনিষেধ না থাকা এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকাই হলো স্বাধীনতা। এতে চিন্তা, মতপ্রকাশ, চলাফেরা, সংগঠন, পেশা, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

৩. সমতা :জাতি, ধর্ম, বংশ, লিঙ্গ, ভাষা বা জন্মস্থান অনুযায়ী কাউকে উচ্চ বা নিম্ন মর্যাদায় না দেখে সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়াই হলো সমতা।

৪. ভ্রাতৃত্ব : দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে আমরা সবাই একই রাষ্ট্রের সন্তান এই আত্মীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে তোলাই হলো ভ্রাতৃত্ব। এই অনুভূতি ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে মজবুত করে।

৩.৪ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

ভারতের সংবিধানের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্য দিয়ে সংবিধানের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১. বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান :

ভারতের সংবিধান অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও বিস্তৃত। বিশ্বের সমস্ত লিখিত সংবিধানের মধ্যে ভারতের সংবিধান সবচেয়েবড়।

২. বিশ্বের বিভিন্ন সংবিধান থেকে নির্বাচিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি

ভারতীয় সংবিধান ভারতের সকল নাগরিককে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। এগুলি রক্ষার দায়িত্ব সংবিধান বিচার বিভাগের উপর অর্পণ করেছে।

৩. দৃঢ়তা ও নমনীয়তার সমন্বয়

যে সংবিধানের বিধানে সহজেই পরিবর্তন করা যায়, তাকে নমনীয় সংবিধান বলে। যে সংবিধানের বিধানে পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন, তাকে দৃঢ় সংবিধান বলে। ভারতের সংবিধান দৃঢ়তা ও নমনীয়তার সমন্বয়।

৪. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

ভারতীয় সংবিধান ভারতের সকল নাগরিককে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। এগুলি রক্ষার দায়িত্ব সংবিধান বিচার বিভাগের উপর অর্পণ করেছে।

৫. নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য

ভারতীয় সংবিধান মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি কিছু মৌলিক কর্তব্যও নির্ধারণ করেছে। প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকে মৌলিক কর্তব্য পালনের প্রত্যাশা রাখা হয়।

৬. রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (নির্দেশাত্মক তত্ত্ব) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার প্রত্যাশা রাখা হয়।

৭. যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি

ভারত হলো রাজ্যগুলির সংঘ (Union of States)। সংবিধান দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতার বিভাজন করেছে। কেন্দ্রীয় স্তরের বিষয়গুলিতে সংসদ আইন তৈরি করতে পারে। আর রাজ্য স্তরের বিষয়গুলিতে রাজ্য বিধানসভা আইন তৈরি করতে পারে।

৮. সংসদীয় গণতন্ত্র

সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটদাতারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

৯. সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার

আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হওয়া প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের ভোটদানের অধিকার রয়েছে এটিকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলে।

তোমরা জানো কী ?

সংবিধান সভার মহারাষ্ট্রের কিছু প্রধান সদস্য

ড. বাবাসাহেব আম্বেডকর	ড. পাঞ্জাবরাও দেশমুখ	শ্রী কেশবরাও জেধে	ড. দুর্গাবাই দেশমুখ	শ্রী শংকররাও দেব
শ্রী নরহর গাডগীল	শ্রী বালাসাহেব খর্ডেকর	শ্রী দাদা ধর্মাধিকারী	শ্রী ব্রজলাল বিয়াণি	শ্রী মাধব (বাপুজি) আণে

অনুশীলনী

প্র. ১ চলো মনে করি।

১. আমি সংবিধানের সূচনা, আমাকে সংবিধানের আত্মা বলা হয় আমি কে ?

----

২. আমি একটি গ্রন্থ যেখানে দেশ পরিচালনার নিয়ম ও আইন রয়েছে আমি কে ?

প্র. ২ জোড়া মিলাও।

'ক' দল	**'খ' দল**
১. স্বাধীনতা	ক) আমি ও অন্যদের মধ্যে ভেদাভেদ না করা।
২. সমতা	খ) আমরা সবাই ভারতীয় এই একতার অনুভূতি।
৩. ভ্রাতৃত্ব	গ) নিজের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ পাওয়া।
	ঘ) যেকোনো কাজ বিনা বাধায় করা।

প্র. ৩ ‘দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য রক্ষা করো।’

ধারণা : সংবিধান একটি পাল্লায় ‘অধিকার’ দিয়েছে এবং অন্য পাল্লায় ‘কর্তব্য’।

প্রশ্ন: নীচের পরিস্থিতিতে ‘ভারসাম্য’ ’কীভাবে রক্ষা করবে ?

১. অধিকার : আমার ‘সর্বজনীন উদ্যানে খেলার অধিকার’ আছে। কিন্তু আমার কর্তব্য কী ?

----

২. অধিকার : আমার ‘সর্বজনীন সম্পদ (যেমন পরিবহন নিগমের বাস) ব্যবহারের অধিকার’ আছে। কিন্তু আমার কর্তব্য কী ?

প্র. ৪ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

১. ধর্মনিরপেক্ষ

২. গণতান্ত্রিক

প্র. ৫ আগামী ১০ বছরে তোমার স্বপ্নের ভারত কেমন হবে সে সম্পর্কে তোমার মত লেখো।

উপক্রম

- বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে সংবিধানের একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করো এবং তাতে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি খুঁজে বের করে লেখো।
- সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক এই শব্দগুলি থেকে ভারতীয় সংবিধানের স্লোগান তৈরি করো এবং শ্রেণীকক্ষে দেয়ালচিত্র হিসেবে লাগাও।

***

৪ স্থানীয় শাসন সংস্থা (গ্রামীণ)

৪.১ গ্রামীণ স্থানীয় শাসন সংস্থার কাঠামো
৪.২ গ্রামপঞ্চায়েত
৪.৩ পঞ্চায়েত সমিতি
৪.৪ জেলা পরিষদ

‘প্রকৃত ভারত গ্রামে বাস করে’। - মহাত্মা গান্ধী

গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলোকে ‘পঞ্চায়েত রাজ’ বলা হয়। গ্রাম, তালুকা ও জেলা স্তরের শাসন সংস্থা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকা উচিত, এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ এই ত্রিস্তরীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। স্থানীয় স্তরের জনপ্রতিনিধিদের হাতে যতটা সম্ভব বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

তোমরা জানো কী ?

২২ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে ৭৩ তম এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাগুলো সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করেছে।

৪.১ গ্রামীণ স্থানীয় শাসন সংস্থার কাঠামো

৪.২ গ্রামপঞ্চায়েত

গ্রামের শাসন পরিচালনা করা এবং গ্রামোন্নয়নের কাজ করার স্থানীয় শাসন সংস্থার নাম হলো ‘গ্রামপঞ্চায়েত’। পঞ্চায়েত রাজ কাঠামোতে গ্রামপঞ্চায়েত হলো মূল ভিত্তি সংস্থা। গ্রামপঞ্চায়েতের

সদস্য সংখ্যা গ্রামের জনসংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্যে গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যা অনুযায়ী কমপক্ষে ০৭ এবং সর্বাধিক ১৭ জন। গ্রামপঞ্চায়েতের মেয়াদ পাঁচ বছর। গ্রামপঞ্চায়েতের সকল সদস্য প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং গোপন ভোট পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে সদস্যের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হওয়া আবশ্যক।

গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচনের জন্য ওয়ার্ড (প্রভাগ) তৈরি করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে সদস্য নির্বাচিত হন। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত থাকে। মহারাষ্ট্রে গ্রামপঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত।

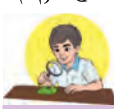

খুঁজে দেখো।

আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে গ্রামপঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য কত শতাংশ আসন সংরক্ষিত?

গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের 'পঞ্চ বা সদস্য' বলা হয়। নির্বাচিত সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সরপঞ্চ এবং একজনকে উপসরপঞ্চ হিসেবে নির্বাচন করে। বর্তমানে অবশ্য মহারাষ্ট্রে সরপঞ্চ সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় । সরপঞ্চ হলেন গ্রামপঞ্চায়েতের জনমনোনীত পদাধিকারী।

গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা : লোকসংখ্যা অনুযায়ী নির্বাচিত

গট গ্রামপঞ্চায়েত

৬০০-র কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট দুটি বা তার বেশি গ্রামের জন্য একটিমাত্র গ্রামপঞ্চায়েত থাকে, তাকে 'গট গ্রামপঞ্চায়েত' বলা হয়।

৪.২.১ গ্রামপঞ্চায়েতের কাজ

গ্রামের উন্নয়নের জন্য গ্রামপঞ্চায়েত নীচের কাজ গুলো করে।

- গ্রামের জন্য রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত করা।
- গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয়জলের ব্যবস্থা এবং নিকাশি ব্যবস্থা করা।
- জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের নথিভুক্তি রাখা।
- গ্রামে পরিচ্ছন্নতা বজায়রাখা।
- গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করা।
- গৃহকর ও জলকর (ট্যাক্স) সংগ্রহ করা।
- গ্রামের নাগরিকদের সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য দেওয়া।

এসো জেনে নিই।

মহারাষ্ট্রের আদর্শ গ্রামপঞ্চায়েত

হিওয়ারে বাজার হলো অহিল্যানগর জেলার একটি ছোট গ্রাম। ক্রমাগত খরা এবং কৃষিতে কম আয় এই গ্রামের নিত্যদিনের সমস্যা ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং জলগ্রহণ অঞ্চলের (ওয়াটারশেড) সংরক্ষণ করা হয়েছিল। গ্রামে প্রচুর গাছ লাগানোর ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর উল্লেখ্য যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় কয়েক বছরের মধ্যেই

হিওয়ারে বাজার একটি সবুজ ও সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হয়েছে। হিওয়ারে বাজার গ্রাম আদর্শ গ্রামপঞ্চায়েতের উদাহরণ তৈরি করেছে। এই কাজের জন্য গ্রামের তৎকালীন সরপঞ্চ শ্রী পোপটরাও পাওয়ারকে ২০২০ সালে ভারত সরকারের পদ্মশ্রী - এই বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

আলোচনা করো।

নীচের ছবি দেখো এবং শ্রেণীকক্ষে তুলনামূলক আলোচনা করো।

একাধিক গ্রামসেবক নিয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর নিয়োগ জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যকারি অধিকারীর দ্বারা করা হয়।

তোমরা জানো কী ?

সরকারি সিদ্ধান্ত তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী গ্রামসেবক পদের নাম পরিবর্তন করে 'গ্রামপঞ্চায়েত অধিকারী' রাখা হয়েছে।

অউন্নত এবং উন্নত গ্রামপঞ্চায়েত

আলোচনা করো।

- আদর্শ গ্রাম বলতে কী বোঝায় ?
- মহারাষ্ট্রের আদর্শ গ্রামগুলোর নাম খুঁজে বের করো।

৪.২.২ গ্রামসেবক/গ্রামপঞ্চায়েত অধিকারী

গ্রামসেবক হলেন গ্রামপঞ্চায়েতের প্রশাসনিক প্রধান। গ্রামপঞ্চায়েতের দপ্তরের কাজকর্ম ও দৈনন্দিন ব্যবহার পরিচালনার জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়। গ্রামসেবক হলেন গ্রামপঞ্চায়েতের সচিব। গ্রামপঞ্চায়েতের প্রয়োজন অনুযায়ী একজন বা

৪.২.৩ গ্রামসভা

গ্রামের সমস্ত ভোটারদের নিয়ে গ্রামসভা গঠিত হয়। গ্রামসভার সভাপতি হলেন সরপঞ্চ। সরপঞ্চের অনুপস্থিতিতে উপসরপঞ্চ গ্রামসভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। গ্রামসভা হলো গ্রামপঞ্চায়েতের কাজকর্মের উপর নজরদারি করা এবং গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার জন্য ১৮ বছরের উপরে সকল ভোটারদের সভা।

গ্রামপঞ্চায়েতের কাজকর্মে গ্রামসভার গুরুত্ব অনেক। মহারাষ্ট্রে গ্রামসভাকে বছরে কমপক্ষে চারটি

বৈঠক করতে হবে এই আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২৬ জানুয়ারি, ১ মে, ১৫ আগস্ট এবং ২ অক্টোবর এই দিনগুলোতে গ্রামসভার বৈঠক হয়। এছাড়া বিশেষ সভা ডাকার অধিকার সরপঞ্চের রয়েছে। সরপঞ্চ গ্রামসভার বৈঠক আয়োজন করে। গ্রামসভার আগে মহিলাদের সভা আয়োজন করা হয়।

করে দেখো।

- গ্রামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গ্রামসভা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।
- তোমার গ্রামের সরপঞ্চের সাক্ষাৎকার নাও। তাঁর মাধ্যমে তিনি গ্রামে কী কী কাজ করেছেন তার তালিকা তৈরি করো।

গ্রামসভার কাজ

গ্রামপঞ্চায়েতের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করা ও তা অনুমোদন দেওয়া, বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা, বিগত আর্থিক বছরের প্রতিবেদন এবং চলতি বছরের কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ধারণ করা - এই ধরনের কাজ নিয়ে গ্রামসভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রামসভার সমস্ত কাজকর্মের নথি গ্রামপঞ্চায়েত অধিকারীর দ্বারা নথিবইতে রাখা হয়।

স্থানিয় কর (গৃহ কর, জল কর) এবং কেন্দ্রীয় সরকার / রাজ্য সরকার/ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অনুদান হলো গ্রামপঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস। এ ছাড়া ও ব্যবসা কর এবং গ্রামপঞ্চায়েতের সম্পত্তির ভাড়া থেকেও তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

কাজটি করো।

বিদ্যালয়ে একটি আদর্শ গ্রামসভা অনুষ্ঠান করো।

ভেবে দেখো।

তুমি যদি সরপঞ্চ হতে, তাহলে কী কী কাজ করতে চাইতে ?

৪.৩ পঞ্চায়েত সমিতি

একটি তালুকার সমস্ত গ্রামের সম্মিলিত উন্নয়ন গট থাকে। উন্নয়ন গটের কাজকর্ম পরিচালনাকারী সংস্থার নাম হলো ‘পঞ্চায়েত সমিতি’। গ্রামপঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদকে সংযুক্তকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে পঞ্চায়েত সমিতি কাজ করে। পঞ্চায়েত সমিতিতে কমপক্ষে ১৫ এবং সর্বাধিক ৪৫ জন সদস্য থাকে।

পঞ্চায়েত সমিতির গঠন

৪.৩.১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি এবং একজনকে উপসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও উপসভাপতির কার্যকাল আড়াই বছরের। পঞ্চায়েত সমিতির সভা ডাকা, সভার সভাপতিত্ব করা, সভার নিয়ন্ত্রণ করা, জেলা পরিষদ থেকে আসা নির্দেশ কার্যকর করা, পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা - এগুলো তাঁর প্রধান কাজ। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপসভাপতি তাঁর কাজকর্ম পরিচালনা করে।

৪.৩.২ গট উন্নয়ন অধিকারী

গট উন্নয়ন অধিকারী (BDO) হলেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রশাসনিক প্রধান। মহারাষ্ট্রে প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে একজন গট উন্নয়ন অধিকারী নিয়োগ করা হয়। তাঁর নির্বাচন মহারাষ্ট্র রাজ্য লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে নেওয়া পরীক্ষা থেকে করা হয়। নিয়োগ অবশ্য মহারাষ্ট্র সরকার করে। তালুকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলো রূপায়ণ করা তাঁর কাজ। তাঁর নিয়ন্ত্রণে পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থা কাজ করে।

৪.৩.৩ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলি

- পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার কাজকর্মের পরিকল্পনা করা।
- জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে চলমান কাজের উপর নজরদারি রাখা।
- জেলা পরিষদ ও গ্রামপঞ্চায়েতগুলোর মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা।
- তালুকার বিকাস যোজনাগুলি বাস্তবায়ন করা।

এগুলো পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কাজ। পঞ্চায়েত সমিতিতে সাধারণ প্রশাসন, সর্বজনীন নির্মাণ, অর্থ, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মহিলা ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিভাগ থাকে। সেগুলোর মাধ্যমে কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। জেলা পরিষদ ও সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি এই কাজগুলো করে।

পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব আয়ের কোনো উৎস নেই। জেলা পরিষদের বাজেটে পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট অন্তর্ভুক্ত থাকে। পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার প্রকল্পগুলো রূপায়ণের জন্য জেলা পরিষদ এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান দেওয়া হয়।

পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কার্যাবলী

খুঁজে দেখো।

- পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচন কে করে ?
- গট উন্নয়ন অধিকারী কাকে বলে ?

৪.৪ জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ হলো স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলোর মধ্যে জেলা স্তরে কার্যরত সর্বোচ্চ সংস্থা। মহারাষ্ট্রে বর্তমানে ৩৬টি জেলা আছে। কিন্তু জেলা পরিষদের সংখ্যা ৩৪টি। এর কারণ হলো রাজ্যের মুম্বই শহর এবং মুম্বই উপনগর এই দুটি জেলা সম্পূর্ণভাবে নগর জনবসতিপূর্ণ হওয়ায়সেখানে জেলা পরিষদ নেই।

জেলা পরিষদে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। জেলা পরিষদে কমপক্ষে ৫০ এবং সর্বাধিক ৭৫ জন সদস্য থাকে। সকল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জেলা পরিষদের পদসিদ্ধ সদস্য। সদস্যদের কার্যকাল পাঁচ বছরের।

৪.৪.১ জেলা পরিষদের সভাপতি

জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি এবং একজনকে উপসভাপপতি হিসেবে নির্বাচিত করে। তাঁর কার্যকাল আড়াই বছরের। জেলা পরিষদ সভাপতির অনুপস্থিতিতে - উপসভাপপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করে। জেলা পরিষদের সভাপতি হলেন স্থায়ী কমিটির - পদসিদ্ধ সভাপতি।

৪.৪.২ মুখ্য কার্যকারী অধিকারী

প্রতিটি জেলা পরিষদের জন্য একজন মুখ্য কার্যকারী অধিকারী (CEO) থাকে। তিনি জেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কাজ করে। জেলা পরিষদের প্রশাসনের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকে। জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যকারী অধিকারী হলেন ভারতীয় প্রশাসন সেবার অধিকারী। তাঁর নিয়োগ রাজ্য সরকার করে। জেলা পরিষদের কাজকর্মে নজরদারি করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো রূপায়ণ করা এগুলো মুখ্য কার্যকারী অধিকারীর প্রধান কাজ।

৪.৪.৩ জেলা পরিষদের কার্যাবলি

জেলা পরিষদে স্থায়ী কমিটি, অর্থ কমিটি, নির্মাণ কমিটি, কৃষি কমিটি, সমাজকল্যাণ কমিটি, শিক্ষা কমিটি, স্বাস্থ্য কমিটি, পশুপালন এবং দুগ্ধশালা কমিটি, মহিলা ও শিশু কল্যাণ কমিটি এবং জল ব্যবস্থাপনা ও জল সরবরাহ কমিটি এই মোট ১০টি কমিটি থাকে। তার মধ্যে স্থায়ী কমিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। প্রতিটি কমিটিতে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। জেলার উন্নয়নের জন্য এই কমিটিগুলোর মাধ্যমে জেলা পরিষদ কাজ করে। তার মধ্যে প্রধানত নীচের কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। জলকর, মেলা কর, বাজার কর এগুলো জেলা পরিষদের আয়ের উৎস। তাছাড়া ভূমি রাজস্বের অনুপাতে নির্দিষ্ট অনুদান রাজ্য সরকার জেলা পরিষদকে দেয়।

জেলা পরিষদের বিভাগ ও প্রধান কার্যাবলি

কমিটি	প্রধান কার্যাবলি
স্থায়ী	১. সাধারণ প্রশাসন, অর্থ ও সমন্বয়। ২. অন্যান্য কমিটির উপরনিয়ন্ত্রণ।
অর্থ	১. জেলা পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা। ২. লেখা পরীক্ষণ করা ।
কৃষি	১. বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রপাতি বিতরণ। ২. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ।
সমাজকল্যাণ	১. অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য আর্থিক সহায়তা। ২. প্রতিবন্ধী ও আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য প্রকল্প।
শিক্ষা	১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা। ২. ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ও পোশাক বিতরণ।
পশুপালন উন্নয়ন	১. পশুপালন উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা। ২. পশুচিকিৎসালয়ের নিয়ন্ত্রণ করা।
জল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	১. পানীয়বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করা। ২. পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা।
নির্মাণ	১. গ্রাম সংযোগকারী রাস্তা ও ছোট সেতু নির্মাণ। ২. পানীয়জলের ব্যবস্থা করা।
স্বাস্থ্য	১. প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) পরিচালনা। ২. রোগ নিয়ন্ত্রণ ও টিকাকরণ।
মহিলা ও শিশু কল্যাণ	১. মহিলা ক্ষমতায়ন ও অঙ্গনওয়াড়ি পর্যবেক্ষণ। ২. পুষ্টি আহার প্রকল্প।

করে দেখো।

তোমার এলাকার জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করো এবং জেলা পরিষদের কাজের পদ্ধতি বুঝে নাও।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা : তুলনামূলক তালিকা

ঘটক	গ্রামপঞ্চায়েত	পঞ্চায়েত সমিতি	জেলা পরিষদ
স্তর	গ্রাম স্তর	তালুকা স্তর	জেলা স্তর
সদস্য সংখ্যা	৭ থেকে ১৭	১৫ থেকে ৪৫	৫০ থেকে ৭৫
পদাধিকারী	সরপঞ্চ, উপসরপঞ্চ	সভাপতি, উপসভাপপতি	সভাপতি, উপসভাপপতি
কার্যকাল	৫ বছর→সরপঞ্চ ৫ বছর→সদস্য	২.৫ বছর →সভাপতি ৫ বছর →সদস্য	২.৫ বছর→সভাপতি ৫ বছর →সদস্য
নির্বাচন	প্রতি ৫ বছরে	প্রতি ৫ বছরে	প্রতি ৫ বছরে
পদত্যাগ	সরপঞ্চ→সভাপতি (পঞ্চায়েত সমিতি) সদস্য→সরপঞ্চ	সভাপতি →সভাপতি (জেলা পরিষদ) সদস্য →সভাপতি	সভাপতি→ বিভাগীয় কমিশনার সদস্য → সভাপতি
প্রশাসনিক অধিকারী	গ্রামসেবক/ গ্রামপঞ্চায়েত	গট উন্নয়ন অধিকারী	মুখ্য কার্যকারী অধিকারী
বৈঠক	অধিকারী মাসিক সভা, গ্রামসভা (বছরে ৪বার)	মাসে একবার	৩ মাসে একবার

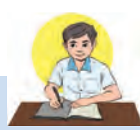

অনুশীলনী

প্র.১ নীচের সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানকারী অধিকারীর সাথে জোড়ি মিলাও।

‘ক’ দল	‘খ’ দল
১) গট উন্নয়ন অধিকারী (BDO)	ক) গ্রামের জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্তি করা।
২) মুখ্য কার্যকারী অধিকারী (CEO)	খ) তালুকার উন্নয়নমূলক কাজে নজরদারি রাখা।
৩) গ্রামপঞ্চায়েত অধিকারী	গ) জেলা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো রূপায়ণ করা।

প্র.২ চিনে নাও আমি কে?

১. গ্রামের ‘প্রথম নাগরিক’।

----

২. জেলা পরিষদের সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখেন।

প্র.৩ তুমি কী করবে?

প্রসঙ্গ ১: তোমার বিদ্যালয়ের রাস্তায় অনেক গর্ত রয়েছে এবং বর্ষাকালে সেখানে জল জমে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি কাকে চিঠি লিখবে?

ক) পুলিশ থানা খ) গ্রামপঞ্চায়েত

গ) ব্যাংক ম্যানেজার ঘ) অন্য

তোমার উত্তর ও কারণ :

প্রসঙ্গ ২ : ২৫০ জন জনসংখ্যাবিশিষ্ট একটি পাড়ায় (বসতিতে) কি গ্রামপঞ্চায়েত স্থাপন করা যাবে ? যদি না যায়, তাহলে সেখানে কোন শাসন সংস্থা কাজ করবে ?

তোমার উত্তর ও কারণ :

প্র.৪ নীচের ধারণাচিত্রটি সম্পূর্ণ করো।

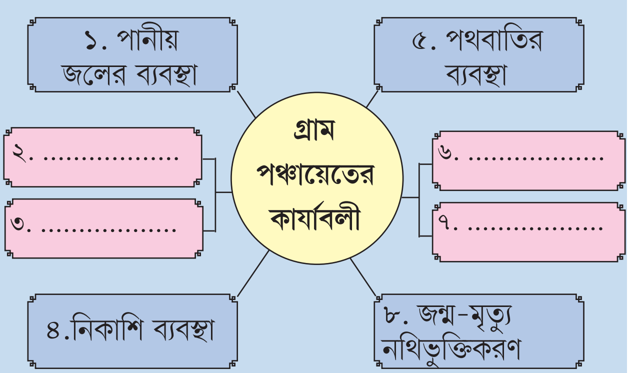

প্র.৫ নীচের প্রবাহ ছকটি সম্পূর্ণ করো।
(মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ স্থানীয় শাসন সংস্থা ত্রিস্তরীয় কাঠামো)

স্তর	জনপ্রতিনিধি প্রধান	প্রশাসনিক প্রধান
গ্রামপঞ্চায়েত	-------------	-------------
পঞ্চায়েত সমিতি	-------------	-------------
জেলা পরিষদ	-------------	-------------

উপক্রম

১. তোমার এলাকায় সম্প্রতি হওয়া উন্নয়ন-মূলক কাজের তথ্য সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

২. এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের ফলে পরিবেশ রক্ষা হয়েছে নাকি ক্ষতি হয়েছে এই বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে দুটি দল করে আলোচনা করো।

৩. প্রাচীন ভারতে আধুনিক কালের গ্রামপঞ্চায়েতের মতো আর ও কোন কোন কাঠামো বিদ্যমান ছিল, তা খোঁজো এবং আলোচনা করো।

উদাহরণার্থ -

- জনপদ
- মহাত্মা বসবেশ্বরের সময়ে ‘অনুভব মন্তপ’
- কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সরকারী কাঠামো

****

৫ স্থানীয় শাসন সংস্থা (শহরাঞ্চল)

৫.১ নগরপঞ্চায়েত

৫.২ নগরপরিষদ

৫.৩ মহানগরপালিকা

৫.৪ ছাউনি পর্ষদ

আগের পাঠে আমরা গ্রামীণ অঞ্চলের স্থানীয় শাসন সংস্থা সম্পর্কে পড়েছি। এই পাঠে আমরা শহরাঞ্চলের শাসনব্যবস্থা ও কার্যাবলী বুঝে নেব। শহরাঞ্চলের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নগরপঞ্চায়েত, নগরপরিষদ, মহানগরপালিকা এবং ছাউনি পর্ষদ অন্তর্ভুক্ত।

নগরায়ণের ফলে আমাদের দেশে শহরের সংখ্যা বাড়ছে। শহরের শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসন সম্পর্কে এসো জেনে নিই।

আলোচনা করো।

শহরের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করো।

৫.১ নগরপঞ্চায়েত

কোনো গ্রামীণ জনবসতির নগরায়ণ শুরু হলে রাজ্য সরকার সেই জনবসতির জন্য নগরপঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করে। নগরপঞ্চায়েত একটি শহরাঞ্চলের স্থানীয় শাসন সংস্থা। এগারো হাজারের বেশি এবং পঁচিশ হাজারের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে নগরপঞ্চায়েত গঠন করা হয়। জনসংখ্যা হলো নগরপঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত।

৫.১.১ নগরপঞ্চায়েতের গঠন

নগরপঞ্চায়েতের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ও গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। নগরপঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচনের জন্য ওয়ার্ড তৈরি করা হয়। সেই ওয়ার্ড থেকে সদস্য নির্বাচিত হন। সভাপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। নগরপঞ্চায়েতে ১৭ জন সদস্য থাকে। মহিলা ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত থাকে।

তোমরা জানো কী ?

মহারাষ্ট্রে মোট ১৪৬টি নগরপঞ্চায়েত রয়েছে। সর্বাধিক নগরপঞ্চায়েত নাগপুর বিভাগে আছে।

নগরপঞ্চায়েতের প্রধানকে 'সভাপতি' বলা হয়। সভাপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছরের। নগরপঞ্চায়েতের সমস্ত কাজ তাঁর সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়।

শহরাঞ্চলীয় শাসন ব্যবস্থা

পৌরনিগম	কটক মণ্ডল	পৌরসভা	নগরপঞ্চায়েত
মেয়র	পৌরপ্রধান	পৌরপ্রধান	সভাপতি
ডেপুটি মেয়র	উপ-পৌরপ্রধান	উপ-পৌরপ্রধান	সহ-সভাপতি
কমিশনার	প্রধান কার্যকারী অধিকারী	প্রধান কার্যকারী অধিকারী	কার্যকারী অধিকারী

নগরপঞ্চায়েত কাঠামো

নগরপঞ্চায়েত

১১,০০০ থেকে ২৫,০০০-এর বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর। রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত।

জনপ্রতিনিধি সদস্য

সভাপতি
- সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত।
- ৫ বছরের কার্যকাল।
- নগরপঞ্চায়েতের সভার সভাপতিত্ব করা।

সহ-সভাপতি
- নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচন।
- ৫ বছরের কার্যকাল।
- সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যভার গ্রহণ।

নির্বাচিত সদস্য
- সরাসরি জনগণ দ্বারা ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচন।
- ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল।
- ৫ বছরের কার্যকাল।

মনোনীত সদস্য
- বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি।
- সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সংখ্যা সীমিত।

প্রশাসন (সরকারি দপ্তর)

কার্যকারী অধিকারী
- রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত।
- প্রশাসনিক প্রধান।
- নগরপঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কর্মচারী
- বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী (যেমন - স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশোনা করা।)

করে দেখো।

নীচের চিত্রে নগরপঞ্চায়েতের কার্যাবলী দেখানো হয়েছে। সেগুলোর নাম নীচে লেখো।

নগরপঞ্চায়েতের কার্যাবলী

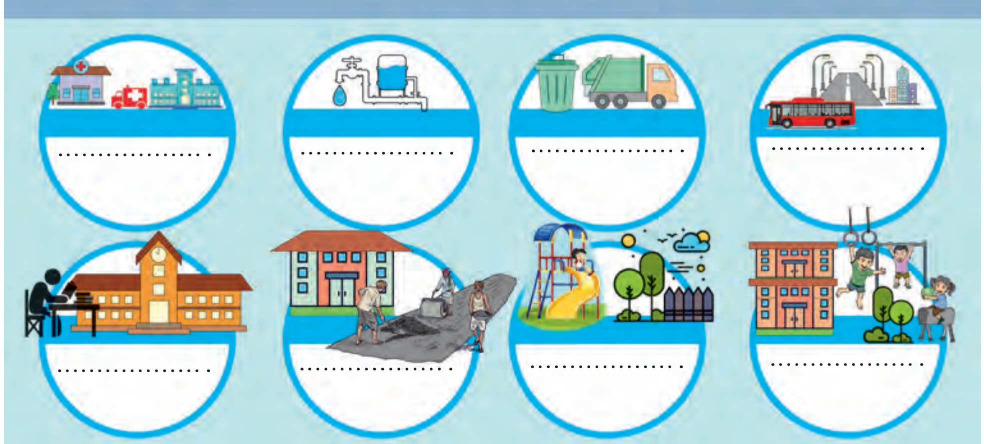

নগরপঞ্চায়েত তার কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন কর নির্ধারণ করে। নগরপঞ্চায়েত সমস্ত কাজ তাদের প্রাপ্ত করের অর্থ থেকে করে। এছাড়াও তারা কিছু সরকারি অনুদানও পায়।

৫.২ নগরপরিষদ

নগরপরিষদ পঁচিশ হাজারের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জনসংখ্যার ভিত্তিতে নগরপরিষদকে ‘অ’, ‘ব’ এবং ‘ক’ - এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

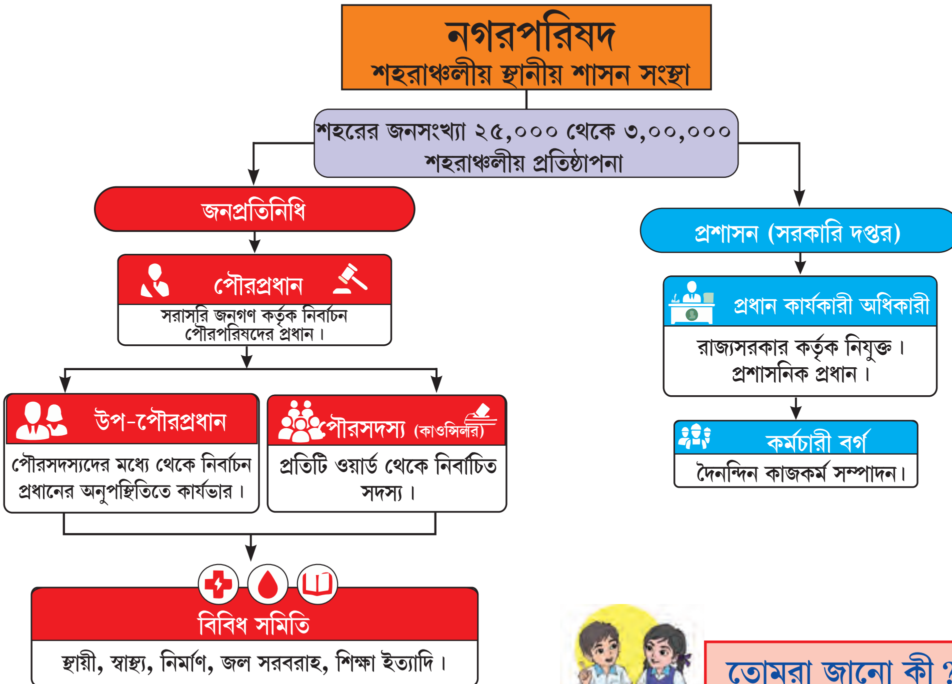

৫.২.১ নগরপরিষদের গঠন

নগরপরিষদে গোপন ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদান পদ্ধতিতে সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁদের 'নগরসেবক' বলা হয়। নগরপরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছরের। নগরপরিষদের সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ১৭ ও সসর্বাধিক ৩৮ থাকে।

তোমরা জানো কী ?

মহারাষ্ট্রে মোট ২৪৮টি নগরপরিষদ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৫০টি নগরপরিষদ পুণে এবং ৪৯টি নগরপরিষদ ছত্রপতি সম্ভাজীনগর বিভাগে রয়েছে। অমরাবতীতে ৪১টি, নাসিকে ৪৫টি, নাগপুরে ৪১টি এবং কোঙ্কণ বিভাগে ২২টি নগরপরিষদ রয়েছে।

সূত্র : (https://mahadma.maharashtra.gov.in/)

নগরপঞ্চায়েত ও নগরপরিষদের কার্যাবলী

মূল প্রকার	কাজের ধরন	বিশদ বিবরণ	
১. প্রয়োজনীয় কাজ	স্বাস্থ্য	১) শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা ও জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। ২) সরকারি ক্লিনিক নির্মাণ করে জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। ৩) সাধারণ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা।	৪) সর্বজনীন স্থানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা। ৫) শহরের নর্দমার ব্যবস্থা করা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা। ৬) শহরে স্বাস্থ্য বিষয়ক জনসচেতনতা তৈরি করা।
	২. ঐচ্ছিক কাজ	১) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ২) সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীকে শিক্ষার মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা।	৩) প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন বিদ্যালয় খোলা ও তত্ত্বাবধান করা। ৪) বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া।
	অন্যান্য	১) রাস্তা ও আলোর ব্যবস্থা করা। ২) শহরের নাগরিকদের জন্ম ও মৃত্যুর (এবং বিবাহের) নথিভুক্তি রাখা।	৩) বিভিন্ন ধরনের কর নির্ধারণ করা। ৪) শহরে শ্মশান ও কবরস্থানের ব্যবস্থা করা।
২. ঐচ্ছিক কাজ		১) সর্বজনীন উদ্যান ও বাগান তৈরি ও পরিচালনা করা। ২) ব্যায়ামাগার ও ধর্মশালা নির্মাণ করা।	৩) খেলার মাঠ উপলব্ধ করে দেওয়া। ৪) দরিদ্রদের জন্য ঘর নির্মাণ করা। ৫) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৫.২.২ নগরাধ্যক্ষ

নগরপরিষদের প্রধানকে 'নগরাধ্যক্ষ' বলা হয়। তাঁর নির্বাচন সরাসরি জনগণের ভোটে হয়। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছরের। নগরাধ্যক্ষ নগরের প্রথম নাগরিক। নগরপরিষদের সমস্ত সভায় নগরাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করেন। নগরপরিষদের আর্থিক প্রশাসনের উপর নগরাধ্যক্ষ নজর রাখেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপনগরাধ্যক্ষ তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। নগরপরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকেই উপনগরাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

৫.২.৩ মুখ্য অধিকারী

নগরপরিষদের প্রশাসনিক প্রধান হলেন মুখ্য অধিকারী। ইনি রাজ্য সরকারের একজন কর্মকর্তা। রাজ্য লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর নির্বাচন হয়। নগরপরিষদের প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর থাকে।

৫.২.৪ নগরপরিষদের আয়ের উৎস

নগরপরিষদের স্বাধীন আয়ের উৎস রয়েছে। নগরপরিষদ তার এলাকায় বিভিন্ন কর নির্ধারণ করে। নগরপরিষদ জমি ও বাড়ি, আমদানি পণ্য, ব্যবসা, বাড়ি, বাণিজ্য ও চাকরি, নাট্যশালা ও চলচ্চিত্র গৃহ, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ আলো ইত্যাদির উপর কর নির্ধারণ করে। নগরপরিষদের খরচ মূলত কর থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে চলে। এছাড়া নগরপরিষদ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য ও অনুদান পায়।

৫.৩ মহানগরপালিকা

মহানগরপালিকা একটি শহরাঞ্চলের স্থানীয় শাসন সংস্থা। যে শহরের জনসংখ্যা তিন লক্ষের বেশি এবং শহরের আয় কমপক্ষে ২ কোটি টাকা, সেই শহরের জন্য মহানগর পালিকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহানগরপালিকা প্রতিষ্ঠার অধিকার মহারাষ্ট্র সরকারের। মুম্বই হলো মহারাষ্ট্রের প্রথম মহানগরপালিকা। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে মোট ২৯টি মহানগরপালিকা রয়েছে।

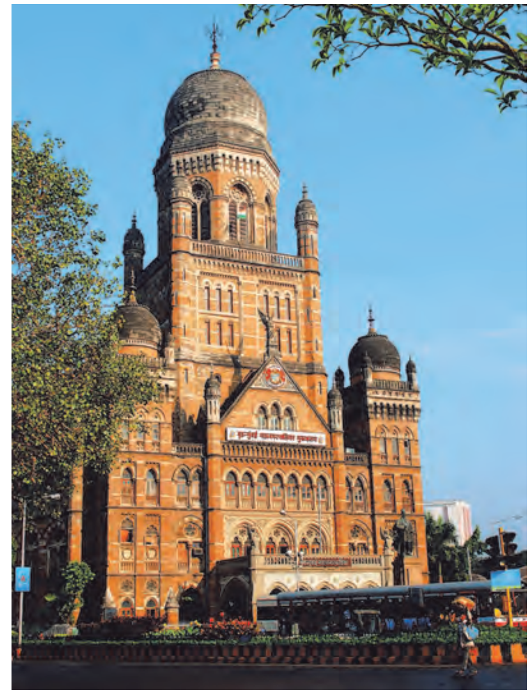

মুম্বই মহানগরপালিকা

৫.৩.১ মহানগরপালিকার গঠন

মহানগরপালিকার সদস্য সংখ্যা শহরের জনসংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। প্রতিটি মহানগরপালিকার সদস্য সংখ্যা রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করে। সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হওয়ার পর জনসংখ্যার অনুপাতে শহরকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে চার সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড কাঠামো রয়েছে। শুধু মুম্বই মহানগরপালিকায় এক সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্ড রয়েছে।

মহানগরপালিকার সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৬৫। মুম্বই মহানগরপালিকায় সর্বাধিক ২২৭ জন সদস্য রয়েছেন। ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সদস্যকে 'নগরসেবক' বলা হয়। নগরসেবকদের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্ক ও গোপন ভোটদানের মাধ্যমে হয়। নগরসেবকের কার্যকাল পাঁচ বছরের।

মহানগরপালিকার কার্যকাল পাঁচ বছরের। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই রাজ্য সরকার মহানগরপালিকা ভেঙে দিতে পারে। মহানগরপালিকা ভেঙে গেলে বা মেয়াদ শেষ হলে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে মহানগরপালিকার নির্বাচন করা বাধ্যতামূলক।

মহানগরপালিকার গঠন/পৌরনিগমের গঠন

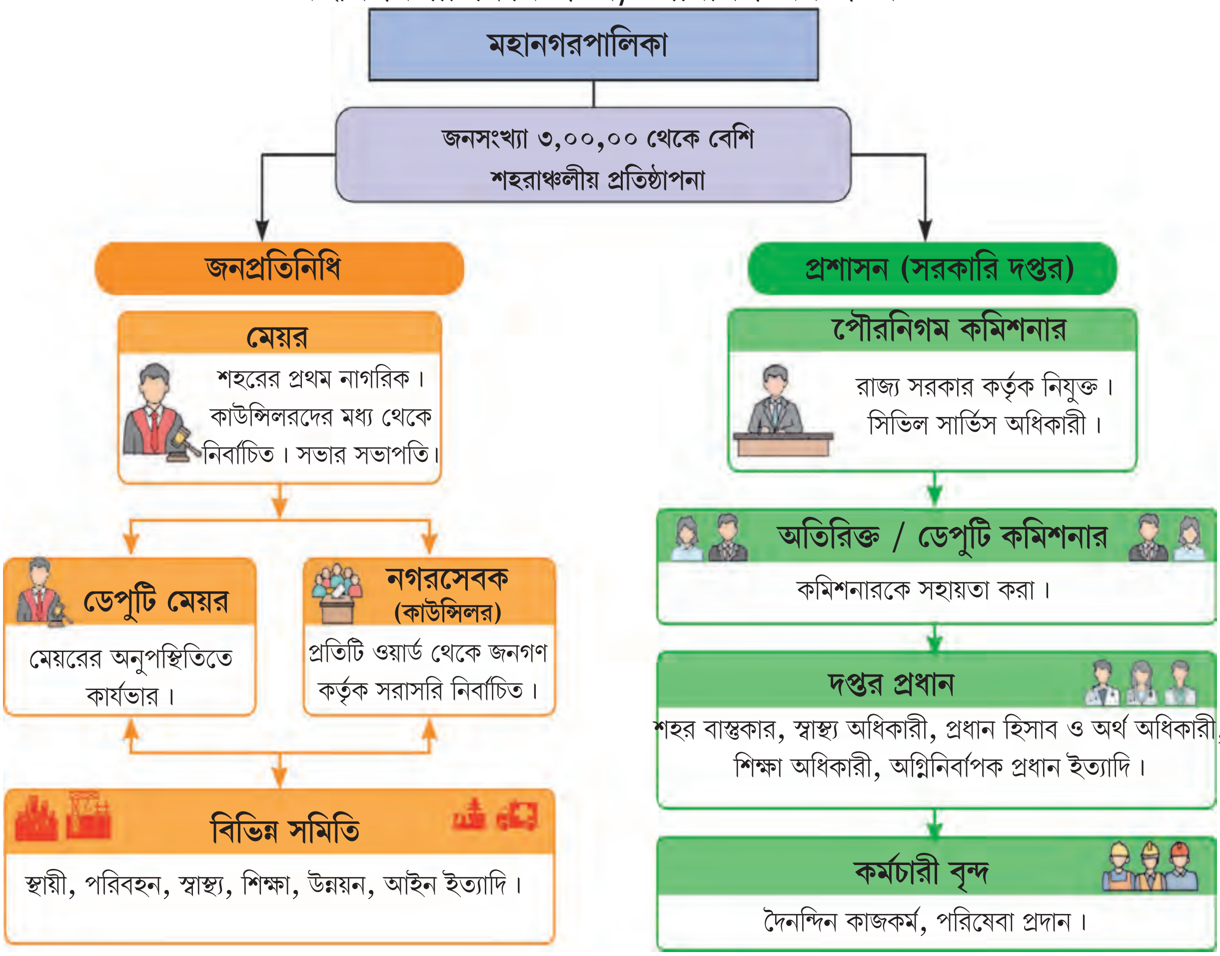

মহানগরপালিকার সভাপতিকে 'মেয়র' এবং উপসভাপতিকে 'উপমেয়র' বলা হয়। মেয়র শহরের প্রথম নাগরিক। মেয়র ও উপমেয়রের কার্যকাল আড়াই বছরের। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা পদত্যাগ করতে পারেন।

৫.৩.২ মহানগরপালিকা কমিশনার

মহানগরপালিকার প্রধান প্রশাসনিক অধিকারি হলেন কমিশনার। তাঁর নির্দেশনায় মহানগরপালিকার সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয়। মহানগরপালিকা কমিশনার রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনার পদে নিযুক্ত অধিকারি ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস.) অধিকারি হন। শহরের প্রশাসনের মূল দায়িত্ব মহানগরপালিকা কমিশনারের উপর থাকে।

৫.৩.৩ মহানগরপালিকার কার্যাবলী

মহানগরপালিকার কার্যাবলীকে আবশ্যক ও ঐচ্ছিক - এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

আবশ্যক কার্যাবলী	ঐচ্ছিক কার্যাবলী
শহরের জলসরবরাহ ও নর্দমার ব্যবস্থা করা।	শহরে বাগান ও উদ্যান তৈরি করা।
বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, শহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, হাসপাতালের ব্যবস্থা করা।	গ্রন্থাগার, নাট্যশালা, স্টেডিয়াম, জাদুঘর নির্মাণ করা।

শ্মশান-কবরস্থানের ব্যবস্থা ও জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্তি রাখা।	শহরে বিনোদনের উপকরণ উপলব্ধ করে দেওয়া।
স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	রাস্তার দুই পাশে ও অন্যত্র বৃক্ষরোপণ করা। শহর সৌন্দর্যায়ন করা।
সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা।	সর্বজনীন পাঠাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা।
শহরের যানবাহন অর্থাৎ পরিবহনের ব্যবস্থা করা।	মেলা, প্রদর্শনীর আয়োজন করা, শহরের ছেড়ে দেওয়া পশুদের বন্দোবস্ত করা।
ভেঙে পড়া বিপজ্জনক বাড়ি থেকে জনগণের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।	অন্যান্য কাজ।

৫.৩.৪ মহানগরপালিকার বিভিন্ন সমিতি

মহানগরপালিকা বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে কাজ করে।

- যেমন - স্থায়ী সমিতি, শিক্ষা সমিতি, পরিবহন সমিতি, জনস্বাস্থ্য সমিতি, আইন সমিতি, সর্বজনীন নির্মাণ সমিতি ও বাজার সমিতি ইত্যাদি।

স্থায়ী সমিতি হলো মহানগরপালিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমিতি।

৫.৩.৫ মহানগরপালিকার আয়ের উৎস

মহানগরপালিকার আয়ের দুটি উৎস রয়েছে।

১. মহানগরপালিকা প্রত্যক্ষ কর নির্ধারণ করে আয় করে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সম্পত্তি কর, যানবাহনের

২. পরোক্ষ আয়ের মধ্যে ফি, সাহায্য আদায় এবং সরকারি অনুদান ও আর্থিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও জনহিতকর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারের অনুমতি নিয়ে ঋণ সংগ্রহের অধিকার মহানগরপালিকার রয়েছে।

৫.৪ ছাউনি পর্ষদ (Cantonment Board)

ছাউনি পর্ষদ হলো শহরাঞ্চলীয় প্রশাসনের একটি প্রকার। একে 'কটক মণ্ডলও' বলা হয়। ১৯২৪ সালে ছাউনি পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সামরিক ছাউনি থাকে সেখানে সাধারণ নাগরিকদের বসবাসও থাকে। এই সামরিক এলাকার নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে এবং তাদের নাগরিক চাহিদা

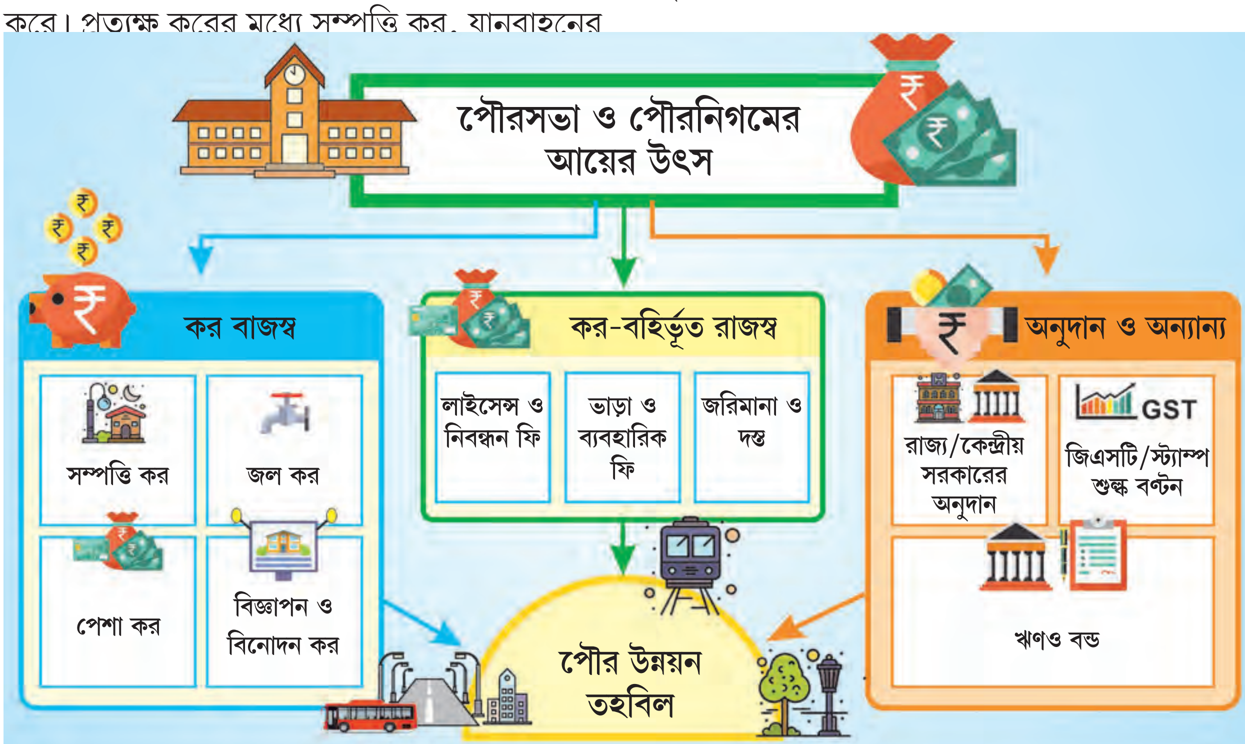

মেটাতে ছাউনি পর্ষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তোমরা জানো কী ?

ভারতে মোট ৬১টি ছাউনি পর্ষদ রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি ছাউনি পর্ষদ মহারাষ্ট্রে আছে। সেগুলো হলো: খড়কি, পুণে ক্যাম্প, দেহু রোড (পুণে), ভিঙ্গার (অহিল্যানগর), দেওলালি (নাসিক), ছত্রপতি সম্ভাজীনগর এবং কামঠি (নাগপুর)।

ভারতের সমস্ত ছাউনি পর্ষদ ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিভিন্ন ছাউনি পর্ষদে সদস্য সংখ্যা আলাদা আলাদা। ছাউনি পর্ষদের প্রশাসনিক প্রধান হলেন কেন্দ্র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কার্যকারী অধিকারী। ছাউনি পর্ষদের জনসংখ্যা অনুযায়ী ওয়ার্ড তৈরি করা হয়। সেই ওয়ার্ড থেকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ছাউনি পর্ষদের সদস্য হন। তাঁদের কার্যকাল পাঁচ বছরের। এছাড়া সমসংখ্যক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সামরিক কর্মকর্তাও থাকেন। এই সকলের মাধ্যমে ছাউনি পর্ষদের কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

ছাউনির প্রধান সেনাধিকারী পদাধিকারবলে ছাউনি পর্ষদের সভাপতি হন। ছাউনি পর্ষদের উপসভাপতি নাগরিক এলাকার সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি হন।

৫.৪.১ ছাউনি পর্ষদের বৈশিষ্ট্য

- ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক ছাউনি পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- কেন্দ্রের অধীনস্থ ছাউনি পর্ষদ হলো একমাত্র স্থানীয় শাসন সংস্থা।
- ছাউনি পর্ষদের খরচের জন্য আবশ্যক আর্থিক সাহায্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে পাওয়া যায়।
- সৈনিকদের এবং তাঁদের সাথে ছাউনিতে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে।
- সামরিক ঘাঁটি সংলগ্ন এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করে।

৫.৪.২ ছাউনি পর্ষদের কার্য

- সামরিক ও নাগরিক বসতি এলাকার স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করা।
- ছাউনি এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাজার ব্যবস্থা, জলসরবরাহ, রাস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যুৎ আলো, বাগান, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পরিকাঠামো সুবিধা প্রদান করা।
- শিশুদের শিক্ষার জন্য ছাউনি এলাকায় বিদ্যালয় পরিচালনা করা এবং শিক্ষামূলক সুবিধা প্রদান

ছাউনি পর্ষদের গঠন: শ্রেণী ও সদস্য সংখ্যা

শ্রেণী	জনসংখ্যার মাপকাঠি	মোট সদস্য	সদস্য কাঠামো: নির্বাচিত সদস্য		সদস্য কাঠামো: মনোনীত/পদাধিকারী
প্রথম শ্রেণী (I)	৫০,০০০-এর বেশি	১৫	৭ নির্বাচিত	+	৮ মনোনীত/পদাধিকারী
দ্বিতীয় শ্রেণী (II)	১০,০০০ থেকে ৫০,০০০	১৫	৭ নির্বাচিত	+	৮ মনোনীত/পদাধিকারী
তৃতীয় শ্রেণী (III)	২,৫০০ থেকে ১০,০০০	৯	৪ নির্বাচিত	+	৫ মনোনীত/পদাধিকারী
চতুর্থ শ্রেণী (IV)	২,৫০০-এর কম	৩	১ নির্বাচিত	+	২ মনোনীত/পদাধিকারী

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ছাউনি পর্ষদে সামরিক প্রশাসনের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য মনোনীত পদাধিকারী সদস্যের সংখ্যা সবসময় নির্বাচিত সদস্যের চেয়ে একজন বেশি থাকে।

করা।

- অগ্নিনির্বাপণ বাহিনীর ব্যবস্থা করা।
- ক্লিনিক, টিকাদান অভিযান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- স্থানীয় কর সংগ্রহ করা এবং সেই করের অর্থ দিয়ে নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

ছাউনি পর্ষদের আয়ের উৎস

- ছাউনি এলাকার প্রত্যক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত আয়।
- কেন্দ্র সরকার ও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য।

অনুশীলনী

প্র.১ নীচের চিত্রগুলো দেখে স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কমপক্ষে ৫টি সুবিধা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

এই সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

....

এই সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

....

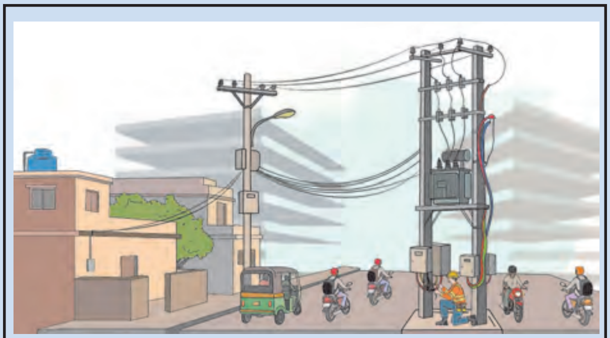

এই সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

....

এই সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

....

প্র.২ বলো দেখি আমি কে ?

১. জনসংখ্যা কম কিন্তু নগরায়ণ শুরু হয়েছে, আমি কে ?

....

২. আমাকে ছাড়া নগরপরিষদের বাজেট (Budget) অনুমোদিত হতে পারে না, আমি কে ?

....

৩. আমি বড়ো শহরের প্রশাসনিক মেরুদণ্ড, আমার নিয়োগ রাজ্য সরকার করে, আমি কে ?

....

প্র.৩ নীচের ধারণা চিত্র (তালিকা) পূর্ণ করো।

স্বায়ত্তশাসন সংস্থা	প্রধান পদাধিকারী	প্রশাসনিক অধিকারী
নগরপঞ্চায়েত	সভাপতি	....
....	....	মুখ্য অধিকারী
....	মেয়র	....

প্র.৪ একটি আদর্শ শহরের ধারণা চিত্র আঁকো, যেখানে নগরাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কমপক্ষে ৫টি সুবিধা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

(যেমন সাইকেল ট্র্যাক, সৌরশক্তি চালিত আলো, বর্জ্য বাছাই কেন্দ্র, উদ্যান, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি।)

প্র.৫ তোমার শহরকে স্মার্ট ও পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলার জন্য কমপক্ষে ৪টি শ্লোগান তৈরি করো।

যেমন : **“শহর আমাদের ঘর,
তাকে পরিষ্কার রাখা আমাদের কর্তব্য !”**

তোমার শ্লোগান :

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

উপক্রম

১. এলাকার সর্বজনীন উদ্যানগুলোর বর্তমান অবস্থা দেখে সেখানে কোন নতুন সুবিধার দরকার তা লেখো।

২. শহরের সর্বজনীন দেওয়ালে স্থানীয় প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার বার্তা দিয়ে চিত্র এঁকেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করো এবং সেখানে কী বার্তা দেওয়া হয়েছে তা খাতায় লেখো।

***

৬ জেলা প্রশাসন

৬.১ জেলা প্রশাসনের পরিচয়
৬.২ জেলা রাজস্ব প্রশাসন: গঠন, কাজ ও অধিকার
৬.৩ জেলা পুলিশ প্রশাসন: গঠন, কাজ ও অধিকার
৬.৪ জেলা ন্যায় প্রশাসন: গঠন ও কাজ

‘‘বাচ্চারা, কল্পনা করো আমরা একটা বিশাল বড় জাহাজে আছি। এই জাহাজে হাজার হাজার মানুষ থাকে। কারো খিদে পেয়েছে, কাউকে হাসপাতালে যেতে হবে, আবার কেউ খেলার জন্য নিরাপদ জায়গা চাইছে। এখন বলো, এত বড় জাহাজে যাতে বিশৃঙ্খলা না হয়, তার জন্য কারো না কারো দরকার হবে না?’’ তাই জাহাজে ক্যাপ্টেন থাকেন। এই ক্যাপ্টেন জাহাজের প্রধান এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে তা সমাধান করেন। জাহাজ টি নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ক্যাপ্টেন-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের জেলাটি ঠিক এই ‘জাহাজ’-এর মতো, আর জেলার জেলাশাসক হলেন তার ক্যাপ্টেন!’’

সাংগলী জেলাধিকারী কার্যালয়

৬.১ জেলা প্রশাসনের পরিচয়

বিভিন্ন জেলা নিয়ে ভারতের রাজ্যগুলি গঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কাঠামো

জেলার নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকে, একেই জেলা প্রশাসন বলা হয়। জেলাকে প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জেলা প্রশাসন হল রাজ্য প্রশাসন ও স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র। রাজস্ব সংগ্রহ, কৃষি সেচ, জনকল্যাণমূলক কাজ, জরুরি পরিস্থিতিতে কাজ, সস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ, নির্বাচন পরিচালনা, স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির কাজকর্মের তদারকি ইত্যাদি দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের।

জেলাশাসক হলেন জেলা প্রশাসনের প্রধান। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল একক হিসেবে জেলাকে দেখা হয়। এই মৌলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত সমস্ত সরকারি কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনাই হল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের তথ্য নীচে দেওয়া হল।

৬.২ জেলা রাজস্ব প্রশাসন: গঠন, কাজ ও অধিকার

জেলা রাজস্ব ব্যবস্থা হল জেলা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এতে জেলাশাসক, অতিরিক্ত

জেলাশাসক, উপবিভাগীয় অধিকারী, তহশিলদার, নায়েব তহশিলদার, মণ্ডল অধিকারী ও গ্রাম রাজস্ব অধিকারী (তলাঠি) অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এই ব্যবস্থা জমি, রাজস্ব প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, নাগরিকদের কাজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও কাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

জেলা রাজস্ব প্রশাসন : গঠন

১. জেলাশাসক	জেলার প্রধান রাজস্ব অধিকারী
২. অতিরিক্ত জেলাশাসক	জেলাশাসককে সাহায্য করেন।
৩. তহশিলদার	তালুকার প্রধান রাজস্ব অধিকারী।
৪. নায়েব তহশিলদার	তহশিলদারকে সাহায্য করেন।
৫. মণ্ডল অধিকারী মণ্ডল পরিদর্শক	একাধিক গ্রামের (গোষ্ঠীর) তদারকি করেন।
৬. তলাঠি	গ্রামের রাজস্ব অধিকারী।
৭. কোতওয়াল	তলাঠিকে সাহায্য করেন।

৬.২.১ জেলাশাসক

জেলাশাসক হলেন ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (IAS) একজন অধিকারী। তিনি জেলা প্রশাসনের প্রধান। কেন্দ্রীয়লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে তাঁর নির্বাচন হয়, তবে তাঁর নিয়োগ রাজ্য সরকারের মাধ্যমে করা হয়। অন্যান্য সব কাজের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বজায়রাখা ও জমির রাজস্ব সংগ্রহ করা তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এর সঙ্গে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষমতাও জেলাশাসকের হাতে থাকে।

তহশিলদার

জেলা বিভিন্ন ছোট ছোট উপবিভাগ নিয়েগঠিত, একেই 'তালুকা' বলা হয়। তহশিলদার হলেন তালুকা প্রশাসনের প্রধান। তালুকার অন্তর্গত সমস্ত গ্রাম ও তালুকার সদর স্থানের প্রশাসনিক দায়িত্ব তিনি পালন করেন।

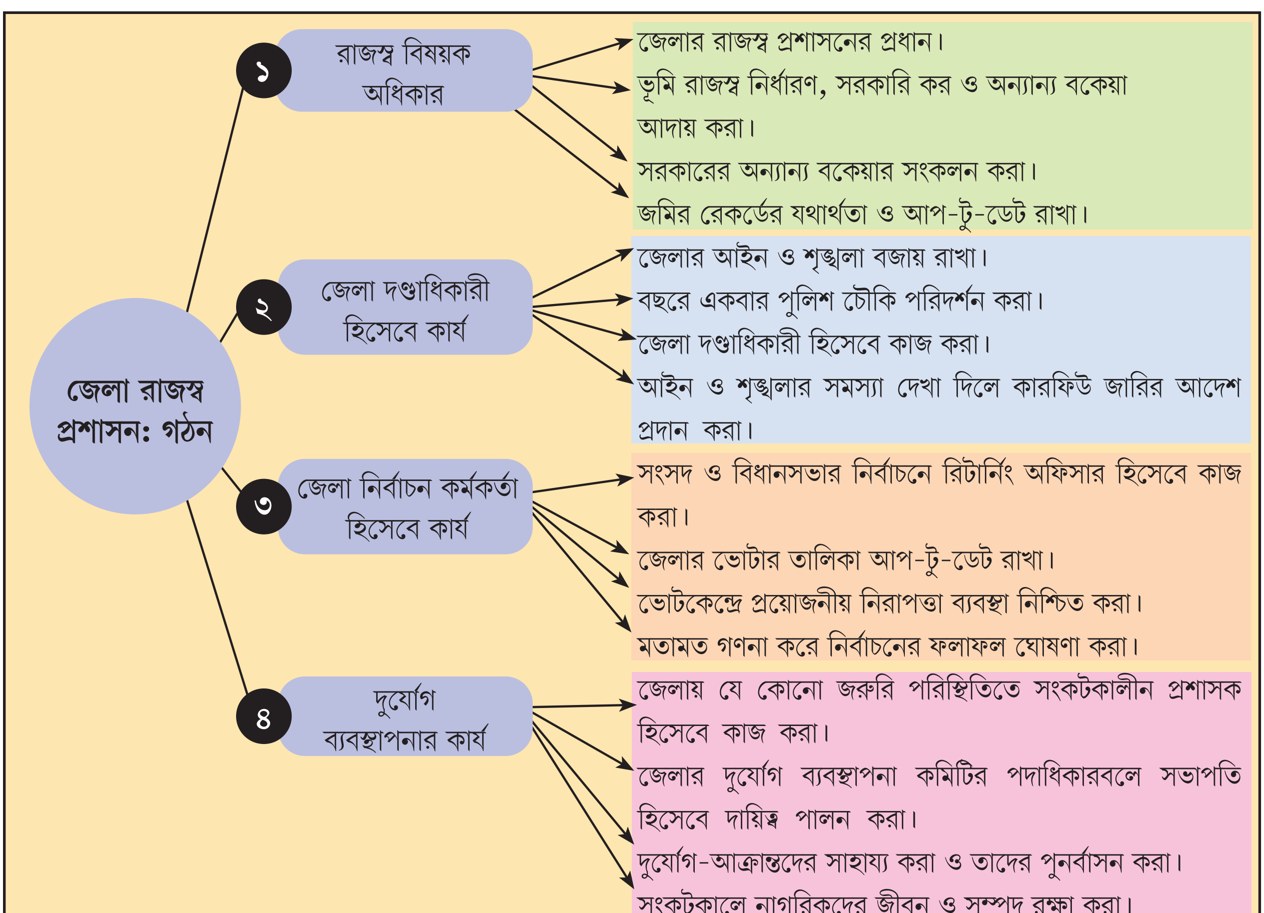

তিনি জেলা শাসকের নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। তাঁর কাজগুলি নিম্নরূপ :

- জমির দলিলের নথিভুক্তিকরণ ও বিভাজন করা।
- জমির রাজস্ব আদায়করা।
- জমিতে অবৈধ দখল হলে তা উচ্ছেদ করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণকাজে অংশগ্রহণ করা।
- নাগরিক সুবিধা সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শংসাপত্র প্রদান করা।
- ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলায় ম্যাজিস্টেট হিসেবে কাজ করা।

করে দেখো।

১. ছবিটি দেখো এবং তা থেকে কী বুঝলে বলো।

২. কেন্দ্র সরকার মেয়েদের উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষার জন্য যে প্রকল্পগুলি চালু করেছে সেগুলির আরও তথ্য সংগ্রহ করো এবং শ্রেণীকক্ষে দলগত আলোচনা করো।

তলাঠি

তলাঠি হলেন গ্রামপর্যায়ে রাজস্ব বিভাগের এবং একজন কর্মচারি। গ্রামীণ বেসামরিক প্রশাসনে তাঁকে নিম্ন দায়িত্বগুলি পালন করতে হয়।

- রাজস্ব আদায়, কর দেনা এবং তা আদায়।
- গ্রামের ভূমি রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষন করা এবং তার সারসংক্ষেপ প্রদান করা।
- খরা, দুর্যোগ, ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- নির্ধারিত নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা।
- জেলা ম্যাজিস্টেট কতৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নিবন্ধন, অভিলেখ ও হিসাব পত্র ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করা।

তলাঠির উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে মন্ডল অধিকারীর হাতে এবং তারপর তহশিলদারের হাতে।

এসো জেনে নিই।

মহারাষ্ট্রের কিছু উল্লেখযোগ্য সরকারি অধিকারীদের কাজ :

ড. রাজেন্দ্র ভারুড (সরকারি অধিকারী IAS)

কোভিড-১৯ মহামারির মোকাবিলা করতে নন্দুরবারের তৎকালীন জেলাশাসক ড. রাজেন্দ্র ভারুড তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে 'অক্সিজেন প্লান্ট' তৈরি করেছিলেন।

ফলস্বরূপ: নন্দুরবার জেলা অক্সিজেন প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়েওঠে। করোনা-আক্রান্ত আদিবাসী মানুষদের বিচ্ছিন্নকরণের জন্য তিনি স্কুল, সমাজমন্দির, ছাত্রাবাস ও ধর্মশালায় অক্সিজেন সুবিধাসহ শয্যার ব্যবস্থা করেন।

ই. ঝেড়. খোব্রাগড়ে (প্রাক্তন সরকারি অধিকারী IAS)

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবায় থাকার সময় ই. ঝেড়. খোব্রাগড়ে সংবিধান সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ উদ্যোগটি চালু করেছিলেন। মহারাষ্ট্র সরকার এই উদ্যোগের স্বীকৃতি দিয়ে ২০০৮ সাল থেকে মহারাষ্ট্রের প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রস্তাবনা পাঠ বাধ্যতামূলক করে দেয়।

৬.২.২ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপরথাকে। উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প জেলাশাসক পরিচালনা করেন। সেগুলির তথ্য নিম্নরূপ:

১. সামাজিক ও কল্যাণমূলক প্রকল্প : সমাজের নারী, শিশু, অনগ্রসর শ্রেণী, সামাজিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণী ইত্যাদির কল্যাণমূলক প্রকল্প। যেমন - বেটি বচাও বেটি পড়াও প্রকল্প, অন্ত্যোদয় প্রকল্প ইত্যাদি।

২. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প : জীবিকা ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাসংক্রান্ত প্রকল্প। যেমন - প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, জাতীয়ও মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রামীণ জীবনোন্নয়ন অভিযান, মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ইত্যাদি।

৩. কৃষিবিষয়ক প্রকল্প : কৃষি উপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সেচ ও সঞ্চয়সুবিধার উন্নয়ন, ফসলে বৈচিত্র্য আনা, কৃষকদের ঋণ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি প্রকল্প জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যেমন - প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চয় যোজনা ইত্যাদি।

বলো তো দেখি !

তুমি যদি ‘জেলাশাসক’ হতে তুমি কী কী করতে ?

৬.৩ জেলা পুলিশ প্রশাসন: গঠন, কাজ ও অধিকার

জেলা পুলিশ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সর্বসাধারণের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা বজায়রাখা এবং অপরাধ দমন করা। পুলিশ ব্যবস্থার সজাগ দৃষ্টির কারণে মানুষ নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার পায়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা হয়।

জেলা স্তরের পুলিশ ব্যবস্থার প্রধান হলেন পুলিশ সুপার (SP), যিনি জেলা পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। জেলার সমস্ত পুলিশ ব্যবস্থা পুলিশ সুপারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে তাঁর নির্বাচন হয়।

খুঁজে দেখো।

‘সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায়’ হল মহারাষ্ট্র পুলিশ বাহিনীর আদর্শবাক্য। এই বাক্যটির অর্থ খুঁজে বের করো।

জেলা পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থার গঠন
১. পুলিশ সুপার (S.P.)
২. অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (Addl. S.P.)
৩. পুলিশ উপসুপার (Dy.S.P.)
৪. পুলিশ পরিদর্শক (P.I.)
৫. সহকারী পুলিশ পরিদর্শক (A.P.I.)
৬. উপপরিদর্শক (P.S.I.)
৭. সহকারী পুলিশ উপপরিদর্শক (A.S.I.)
৮. পুলিশ হাবিলদার (H.C.)
৯. পুলিশ কনস্টেবল (P.C.)

৬.৩.২ পুলিশ সুপারের কাজ ও ক্ষমতা

- জেলার অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ তৈরি করা।
- যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাপনা করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব জেলা পুলিশ প্রশাসনের উপর থাকে।

তোমরা জানো কী ?

সাইবার অপরাধ

কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করে তার তথ্য হ্যাক (চুরি) করা, তার অপব্যবহার করা, ভাইরাস পাঠানো, ই-মেলের মাধ্যমে প্রতারণা, ভয়দেখানো, মুক্তিপণ চাওয়া এই ধরনের কাজকেই সাইবার অপরাধ বলা হয়।

সাইবার হেল্পলাইন ফোন নম্বর ১৯৩০

৬.৪ জেলা ন্যায় প্রশাসন: গঠন ও কাজ

জেলা বিচারক হলেন জেলা স্তরের প্রধান আইনগত কর্তৃপক্ষ। যখন - তিনি দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত কাজ করেন, তখন তাঁকে জেলা বিচারক বলা হয় এবং যখন তিনি ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত কাজ দেখেন, তখন তাঁকে 'দায়রা বিচারক' বলা হয়।

৬.৪.১ জেলা আদালত

প্রতিটি জেলার জেলা আদালতে একজন প্রধান বিচারক থাকেন, তাঁকে জেলা বিচারক বলা হয়। জেলা বিচারককে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য আরও কিছু অধীনস্থ বিচারক থাকেন। জেলা আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি - উভয় ধরনের কাজ দেখা হয়। জেলার ন্যায় বিষয়ক সব রকমের বিবাদ নিরাকরণের অধিকার জেলা ন্যায়লয়ের কাছে থাকে ।

জেলা আদালত

> প্রতিটি জেলার জেলা আদালতে একজন প্রধান বিচারক থাকেন, তাঁকে জেলা বিচারক বলা হয়। জেলা বিচারককে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য আরও কিছু অধীনস্থ বিচারক থাকেন। জেলা আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ধরনের কাজ দেখা হয়।

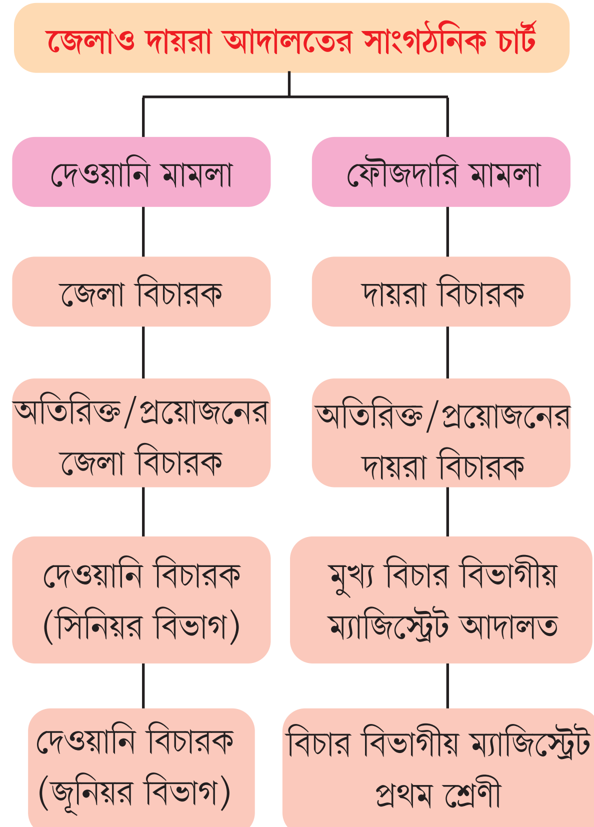

৬.৪.২ জেলা আদালতের কাজ

১. আইনি অধিকার : জেলা আদালত জেলা স্তরে দেওয়ানি মামলা ও ফৌজদারি মামলার শুনানি করে।

- **দেওয়ানি মামলা :** ক) জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দখল, অবৈধ অনুপ্রবেশ ইত্যাদি বিবাদের দাবি পরিচালনা করা। খ) পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দাবির মামলা।
- **ফৌজদারি মামলা :** ৩ বছরের বেশি শাস্তির বিধান আছে এমন সমস্ত অপরাধের মামলা দায়রা আদালতে চলে। যেমন - ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ।

২. আপিল শুনানি : জেলা আদালত জেলার আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে। অধীনস্থ আদালতের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে 'আপিল আদালত' হিসেবে এটি পরিচিত। দেওয়ানি বিচারক (উচ্চস্তর) ও প্রধান বিচারিক দণ্ডাধিকারীর রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের

করা আপিল পরিচালনার ক্ষমতা জেলা আদালতের রয়েছে।

৩. প্রশাসনিক অধিকার : জেলা ও দায়রা আদালতের অধীনস্থ আদালতের কর্মীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সমস্ত ক্ষমতা জেলা আদালতের হাতে থাকে।

জেলা স্তরের আদালত সমূহ

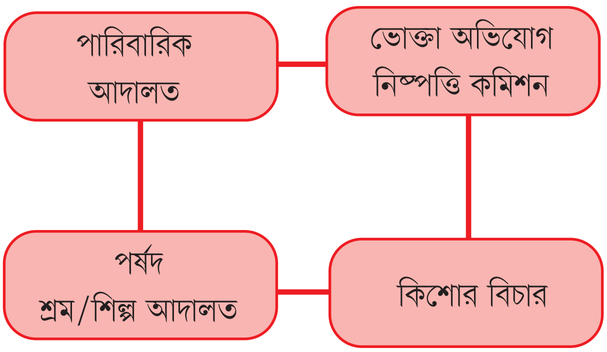

এসো জেনে নিই।

ন্যায় সেবা কর্তৃপক্ষ কী ?

সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের বিনামূল্যে আইনি সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতে ১৯৮৭ সালে ন্যায় সেবা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে আদালত বা আইন বিষয়ক বিনামূল্যে সেবা ও সাহায্য দেওয়াই ন্যায় সেবা কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য। আর্থিক বা অন্য কোনো অক্ষমতার কারণে কোনো নাগরিক যাতে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হন এটিই এই ন্যায় সেবা কর্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য।

অনুশীলনী

প্র.১ চিনে নাও দেখি, আমি কে ?

১. আমি জেলার প্রথম প্রশাসনিক অধিকারী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি।
....

২. আমি গ্রাম স্তরে শান্তি বজায় রাখতে পুলিশকে সাহায্য করি।
....

৩. আমি তালুকা স্তরে রাজস্ব সংগ্রহ করি এবং 'তালুকা দণ্ডাধিকারী' নামেও পরিচিত।
....

৪. আমি জেলার অপরাধ দমনে পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দিই।
....

প্র.২ নীচের পরিস্থিতিতে তুমি কোন অধিকারীর কাছে যাবে ?

১. তোমার জমির 'সাত-বারা' উদ্ধৃতি (জমির নথি) দরকার হলে -
....

২. তোমার এলাকায় চুরি হয়েছে এবং অভিযোগ নথিভুক্ত করতে চাইলে -
....

৩. দুই ব্যক্তির মধ্যে জমির বিবাদ আদালতে নিয়ে যেতে চাইলে -
....

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন - শিলাবৃষ্টি) কারণে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য -
....

প্র.৩ নীচের ছকটি পূর্ণ করো।

অধিকারী	কাজ
জেলাশাসক	জেলার রাজস্ব সংগ্রহ করা ও আইনশৃঙ্খলা বজায়রাখা।
জেলা পুলিশ সুপার	....
তহশিলদার	....
জেলা বিচারক	....
তলাঠি	....

প্র. ৪ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

১. জেলাশাসক

২. তহশিলদার

প্র. ৫ কল্পনা করো এবং লেখো: ‘আমি যদি জেলাশাসক হতাম..... !’

তোমার জেলায়প্রবল বৃষ্টির ফলে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই সময়ে জেলা শাসক হিসেবে তুমি কোন তিনটি কাজ কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে এবং কেন ?

উপক্রম

১. জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে জরুরি যোগাযোগ নম্বরের তালিকা তৈরি করো।

২. জেলাশাসক এবং অন্যান্য বিভাগের প্রধানরা (যেমন - শিক্ষা, স্বাস্থ্য) মিলে জেলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করছেন এই বিষয়ে একটি ছোট নাটক উপস্থাপন করো।

৩. তোমার এলাকার যেকোনো একজন প্রশাসনিক অধিকারীর সাক্ষাৎকার নাও।

৪. জেলাশাসক বা তহশিলদার হতে হলে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় তা জেনে নাও এবং শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

***

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, অধিক তথ্যের জন্য এগুলি পড়ো।

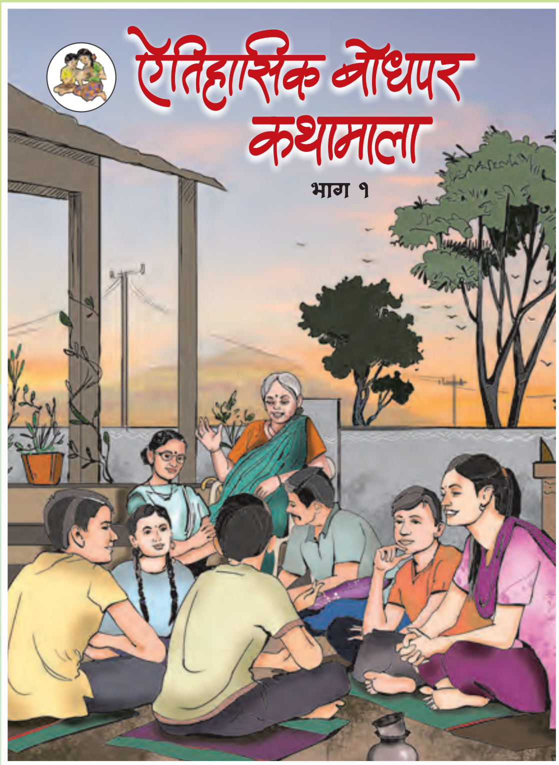

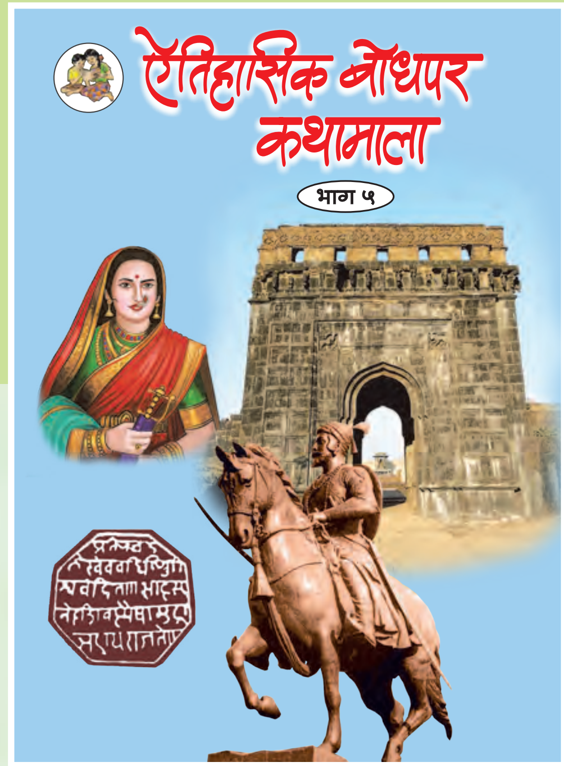

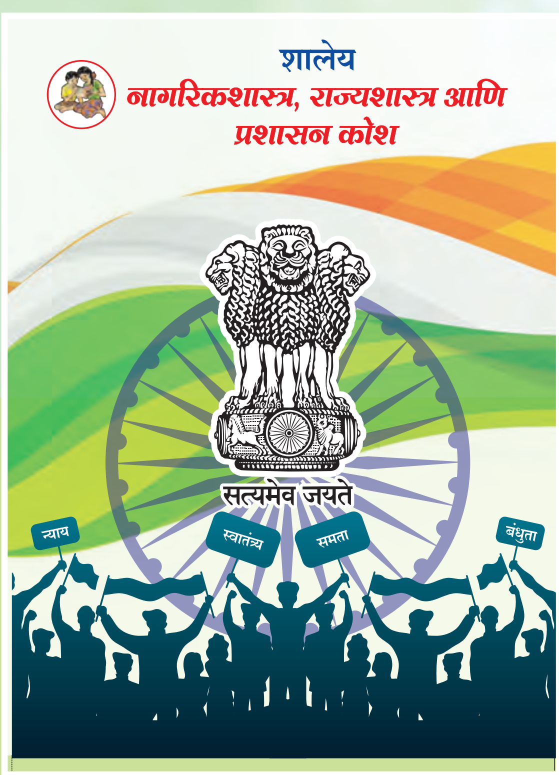

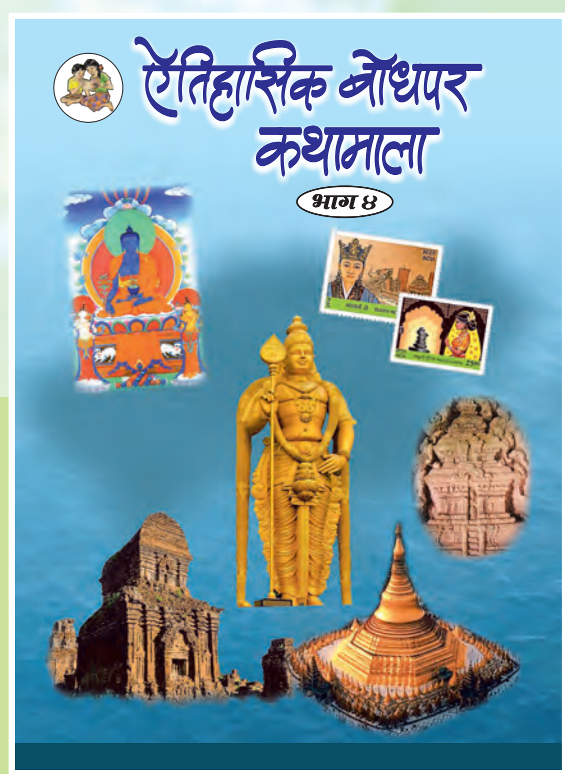

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে ছোঁয় অথবা এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।

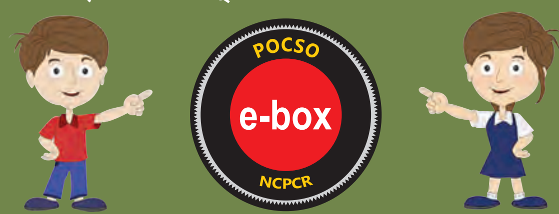

এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরণের সমস্যাজড়িত ছেলে / মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।

চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।

এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে.

इतिहास व नागरिकशास्त्र इयत्ता सहावी (बंगाली माध्यम)

₹ 89.00